নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক

শ্রীযামিনীমোহন কর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট … কলিকাতা-৬

এক টাকা বারো আনা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ—১৩৬২

ভূমিকা

পরাধীন জাতি নিজের দেশের গৌরবের দিকে নজর দেবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না। শাসকের গৌরবেই তার গৌরব, শাসকের কৃষ্টিই তার কৃষ্টি। নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলাই হ'ল পরাধীনতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারতবাসীকে জাগতে হবে। লুপ্ত বৈশিষ্ট্যকে, কৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। যে শিক্ষা এ কাজে জাতিকে সাহায্য করবে না, তা ব্যর্থ শিক্ষা।

এখন বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে দ্রুত তালে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে। আমরা এতদিন ধরে জেনে এসেছি বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের কথা। আজ সময় হয়েছে নিজেদের দেশের বিজ্ঞান-সাধকদের কথা জানবার। তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা "নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক"। সকলের কথা বলা সম্ভব হয় নি। স্থানাভাবই তার প্রধান কারণ। ভবিষ্যতে আরও অনেকের কথা লেখবার ইচ্ছা আছে। জীবনীগুলি জন্ম-ক্রমে সাজান আছে। কয়েকজনের জীবনী পরে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই তাতে কোন ক্রম নেই। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা প্রার্থনীয়। বিনীত—

যামিনীমোহন কর

সূচীপত্র

নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক

জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় রাড়িখাল গ্রাম। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। জগদীশচন্দ্রের শৈশব সেইখানেই অতিবাহিত হয়।

তখনকার দিনে সন্তানদের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করা আভিজাত্যের লক্ষণ হিসাবে ধরা হত! এ মোহ এখনও আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু ভগবানচন্দ্র স্বয়ং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও পুত্রকে শৈশবকালে প্রেরণ করলেন বাংলা প্রাথমিক স্কুলে। এই থেকে তাঁহার দেশপ্রেম, জাতীয়তা-বোধ এবং অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্যালয়ে কৃষক, সূত্রধর, ধীবর প্রভৃতির ছেলেরাও পড়ত। জগদীশচন্দ্রের দক্ষিণে তাঁর পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র আর বামে এক ধীবর পুত্র বসত। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাদের নিকট হ'তে বাল্যকালে পশু-পক্ষী, জলজন্তু ইত্যাদির

যে সকল বৃত্তান্ত শুনেছিলেন ভবিষ্যতে তাই বোধহয় তাঁকে প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনের প্রেরণা দিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের মাতা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা। তাঁর হৃদয়ে কোনরূপ সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না। জগদীশচন্দ্র যখন স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে বাড়ী ফিরতেন তখন তাঁর মাতা নিজে সকলকে খাবার ভাগ করে দিতেন। জগদীশচন্দ্র বলেছেন যে, বাল্যে তিনি ছোট বড় জাতি বা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে তা জানতেন না।

ভগবানচন্দ্রের উদার হৃদয়ের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। একটি লোকে ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে বিচারের জন্য তাঁর নিকট প্রেরিত হয়। বিচারে তার জেল হয়। দণ্ডভোগের পর সে বিচারকের নিকট এসে বলে, "হুজুর আমাকে তো আর কেউ কাজ দেবে না। আপনিই চাকর রাখুন! তা না হলে অনাহারে মরতে হবে।" দয়ালু ভগবানচন্দ্র তাকে বিমুখ করতে পারলেন না। বললেন, "বেশ, তুই এই খানেই থাক। আমার ছেলেকে দেখাশুনা করবি। রোজ তাকে স্কুলে নিয়ে যাবি, আবার স্কুল থেকে নিয়ে আসবি।" সেই থেকে জগদীশচন্দ্রের দেখাশুনার লোক এবং খেলার সঙ্গী হল এই ডাকাতটি।

সুযোগ পেলে পরিবর্ত্তন যে সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত এই ডাকাত চাকর। অপরাধী হয়ে উঠল কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বাসী ভৃত্য। জগদীশচন্দ্রকে রোজ কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেত আর ছুটীর পর নিয়ে আসত। আর ডাকাতির কত রোমাঞ্চকর

গল্প বলত। তাকে না হলে জগদীশচন্দ্রের মোটেই চলত না।

একবার ছুটীর সময় ভগবানচন্দ্র সপরিবারে নৌকা যোগে দেশে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা পদ্মা পাড়ি দিচ্ছিলেন, সেই সময় একখানা ডাকাতের নৌকা তাঁদের তাড়া করে। সকলেই ভীত হয়ে পড়েছেন, এমন সময় এই ভৃত্যটি ছইএর ওপর দাঁড়িয়ে কি এক সঙ্কেত ধ্বনি করল, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের নৌকা কোথায় সরে পড়ল। সমগ্র পরিবার রক্ষা পেল।

ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে যে মেলা ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে অনেক যাত্রার দল আনা হ'ত। অভিনয় হ'ত অধিকাংশই পৌরাণিক নাটক। সারা রাত জেগে জগদীশচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে সেই পালা দেখতেন। রামায়ণ মহাভারতের মহিমময় বীর চরিত্রগুলি, বিশেষ করে মহাবীর কর্ণের চরিত্র তাঁর হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছিল। কর্ণের চরিত্র এত ভালো লাগার কারণ বড় বয়সে তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন—"ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম চিরপ্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক সময় মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

ডাকাত-ভৃত্যের মারামারির গল্প আর যাত্রার এই সকল যোদ্ধাদের সংগ্রাম তাঁর মনে যোদ্ধৃ-বৃত্তি জাগ্রত করে তুলত।

সকল বিপরীত পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াবার মনোবল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভৃত্যের জীবনে, মহাবীর কর্ণের চরিত্রে। পরবর্ত্তী কালে এই মনোবল তাঁকে সাহায্য করেছিল সকল বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে। শরীরচর্চ্চা ও লাঠিখেলা এই ডাকাতের কাছে তাঁর বেশ ভাল করে শিক্ষা হয়েছিল।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় ফরিদপুরে বাঙ্গলা স্কুলে। সেখানকার শিক্ষা শেষ হলে ভগবানচন্দ্র পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। এখানে জগদীশচন্দ্র মাত্র তিন মাস অধ্যয়ন করেন। পরে ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সে সময় পিতা ভগবানচন্দ্র বর্দ্ধমানে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার। কাজেই জগদীশচন্দ্রকে থাকতে হ'ত হোষ্টেলে। সেখানে সকলেই সাহেবদের ছেলে। অধিকাংশ কলেজের ছাত্র, বয়সে বড়। তারা বাঙ্গালীদের সহ্য করতে পারত না। তাঁর হাতের ঘুষি খেয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ আপনিই বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকে মেনে নিতে তারা বাধ্য হয়।

১৮৭৫ সালে ষোল বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষা পাশ করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি এফ্-এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৮৮০ সালে বিজ্ঞানে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এইবার তিনি জজ অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার জন্য আই-সি-এস্ পড়তে বিলাত যাবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর পিতার সম্পূর্ণ অমত ছিল। ভগবানচন্দ্র পুত্রকে বিজ্ঞান অথবা ডাক্তারী পড়বার জন্য বিলাত যেতে বলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে জগদীশচন্দ্র গতানুগতিক চাকরী করেন। তিনি চেয়েছিলেন যে পুত্র এমন কিছু শিখে আসুক যাতে দেশের উন্নতি হয়। অবশেষে তাই স্থির হল কিন্তু মাতা বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। জগদীশচন্দ্রের যখন বয়স ১৭ বছর তখন তাঁর ১০ বছরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি মারা যান। তাই মাতা জগদীশচন্দ্রকে অতদূরে পাঠাতে অসম্মত হন। এদিকে ১৮৮০ সালে বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু লোক মারা যায়। মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণের জন্য তদানীন্তন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ভগবানচন্দ্র আর্থিক সাহায্য তো করেনই উপরন্তু তাদের সন্তান-সন্ততিদের কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে তিনি বেশ কিছুটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে মোটা বেতনের চাকরী লাভ করা, যাতে পিতার কিছু সুবিধা হয়। এই সময় হঠাৎ একদিন জননীর মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি জগদীশচন্দ্রকে বলেন, "আমি মন শক্ত করে ফেলেছি। তোর বিলাত যাওয়ার ইচ্ছাতে আমি আর বাধা দেব না। তবে তোর বাবার হাতে তো কিছুই নেই। আমার গয়না ও কিছু টাকা আছে, তাই দিয়ে যাবার আয়োজন কর।"

এই সময় ভগবানচন্দ্র পাবনায় বদলী হয়ে এসেছেন। মায়ের অনুমতি পেয়ে জগদীশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করলেন। সিভিল সার্ভিসের জন্য নয়, পতার ইচ্ছানুযায়ী ডাক্তারি পড়তে।

কলেজে পড়বার সময় জগদীশচন্দ্র একবার আসামে বেড়াতে যান এবং সেখান থেকে জ্বর নিয়ে ফেরেন। তারপর থেকে প্রায়ই তিনি জ্বরে ভুগতেন। জাহাজেও তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হ'ন। প্রায় মারা যাবার দাখিল। লণ্ডনে পৌঁছে তিনি ডাক্তারী পড়া আরম্ভ করলেন, কিন্তু জ্বর তাঁকে ত্যাগ করল না। এইখানেই ধরা পড়ল যে এই জ্বর কালা-আজর। এক বৎসর ডাক্তারী পড়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠবার পর অধ্যাপকেরা তাঁকে ডাক্তারী পড়তে বারণ করলেন কারণ ভগ্নস্বাস্থ্যে এত পরিশ্রম তাঁর সহ্য হবে না। অগত্যা লণ্ডনে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে ১৮৮১ সালের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজে ক্রাইষ্ট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হলেন। এখানে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পড়তে আরম্ভ করলেন। সেখানেও জ্বর তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি। একবার প্রায় এক বছর ধরে জ্বরে ভুগেছিলেন। বিরক্ত হয়ে সব ঔষধ পত্র ছেড়ে দু'বেলা নিয়মিত দাঁড় টেনে তাঁর স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তিন বছর অধ্যয়নের পর ১৮৮৪ সালে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস্‌' পাশ করলেন এবং কিছুদিন পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস্‌সি উপাধি লাভ করে স্বদেশ যাত্রা করলেন।

তৎকালীন বিলাতের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল প্রসিদ্ধ অর্থবিদ্ অধ্যাপক ফসেট্ সাহেবের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে ফসেট্ সাহেব জগদীশচন্দ্রকে ভারতে প্রত্যাগমনের সময় তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপণের কাছে ভাল চাকরীর জন্য এক সুপারিশ পত্র দেন। সেই চিঠি নিয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে সিমলায় লর্ড রিপণের সঙ্গে দেখা করেন। বড়লাট বঙ্গীয় সরকারকে জগদীশচন্দ্রের চাকরীর জন্য এক পত্র দেন এবং তাঁকে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীরা কালা আদমীকে সমপর্য্যায়ের চাকরী দিতে নারাজ। ওদিকে বড়লাটের চিঠি, উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। উভয় দিক বজায় রেখে কূটনীতিজ্ঞ ডিরেক্টর সাহেব জগদীশচন্দ্রকে জানালেন যে, আই-ই-এস্এ চাকরী খালি নেই, তবে ইচ্ছা করলে বি-ই-এস্এ চাকরী খালি হলে একটা পেতে পারেন। বলা বাহুল্য যে জগদীশচন্দ্র এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না, ফলে চাকরীও পেলেন না।

এদিকে লর্ড রিপণ খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, তাঁর সুপারিশ সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রের চাকরী হয় নি। তিনি বাংলা সরকারের কাছে বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করলেন। অগত্যা ডিরেক্টর সাহেব জগদীশচন্দ্রকে আই-ই-এস্এ অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করলেন। আশা দিলেন যে, পরে সুবিধা হলে পাকা করা

হবে। জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন, কিন্তু এই পদে শ্বেতাঙ্গরা যে বেতন পেতেন, তাঁর জন্য বরাদ্দ হ'ল তার দুই-তৃতীয়াংশ। তারও পর আবার বেতন নিতে গিয়ে শুনলেন যে, পদ অস্থায়ী বলে অর্দ্ধেক কেটে নেওয়া হবে। স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগল। তিনি এই বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। তখন তিনি সে বেতন নিতে অস্বীকার করে সুদীর্ঘ তিন বছর বিনা বেতনে কাজ করলেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতার আর্থিক অবস্থা এই সময় অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। তিনি তখন ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সংসার প্রায় অচল। তবু জগদীশচন্দ্র সম্মান হারিয়ে অর্দ্ধ বেতন নিতে রাজী হলেন না। তাঁর গুণবতী সহধর্ম্মিণী সর্ব্বদাই স্বামীকে আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় উৎসাহিত করতেন এবং অভাব অনটন হাসিমুখে সহ্য করতেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জয় হ'ল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উপযুক্ত বেতনে স্থায়ী করে দিলেন এবং পূর্ব্বের তিন বছরের পূরো বেতন একযোগে তাঁকে দেওয়া হ'ল। সেই টাকায় যতটা সম্ভব পিতৃঋণ শোধ করলেন। অবশিষ্ট যা রইল তাও কিছু কিছু করে ছয় বছরে সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছিলেন। এর এক বছর পরে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং আরও দুই বছর পরে জননীরও মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্রকে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে সপ্তাহে ছাব্বিশ

ঘণ্টা পড়াতে হ'ত। তার ওপর গবেষণা। সরকার তাঁকে গবেষণার জন্য কোন সাহায্য করেন নি। কলেজে গবেষণার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও ছিল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেশীয় মিস্ত্রি দিয়ে নিজ ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তৈরী করালেন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও ১৮৯৫ সালে তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটিতে তাঁর মৌলিক গবেষণার বিবরণী প্রকাশ করতে সক্ষম হন। বিষয় ছিল বৈদ্যুতিক রশ্মির প্রতিসরণ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন। তখন ভারত সরকার আর চোখ বুজে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় দেখে তাঁকে জানালেন যে, গবেষণা ও যন্ত্রপাতির জন্য যা খরচ হয়েছে তা সমস্তই তাঁকে দেওয়া হবে। জগদীশচন্দ্র এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা তাঁরা নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে গবেষণার জন্য বাৎসরিক আড়াই হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হ'ন। কিন্তু উপযুক্ত গবেষণাগার তৈরী করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

প্রথম জীবনে তিনি বিদ্যুৎ ও ঈথর তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। এই সময় তিনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। আমেরিকায় লজ্‌ ও ইটালীতে মার্কনিও তখন এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলেন কিন্তু প্রথম সাফল্য লাভ করেন জগদীশচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে তাঁর বাসায় তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে বিনা তারে সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এমন সময় পশ্চিম থেকে আহ্বান এল, বিলাতে তাঁকে অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। হাতের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি বিলাত চলে গেলেন। তিনি যদি তখন তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট নিতেন তবে অগাধ অর্থের অধিকারী হ'তে পারতেন, আর বেতার আবিষ্কারের যশোমাল্য মার্কনির কণ্ঠে তুলত না, শোভা পেত তাঁরই গলায়।

তিনি বিলাত থেকে লিখেছিলেন যে, বিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী মেসার্স ম্যুরহেড অ্যাণ্ড কোম্পানী তাঁর নির্দেশ অবলম্বন করে বিনা তারে টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করেছিলেন। তিনি এই সময় এই সম্পর্কে আরও অনেক নূতন তথ্য সম্বলিত এক প্রবন্ধ লেখেন। ডাঃ ম্যুরহেড তাঁকে এগুলি গোপন রাখতে অনুরোধ করেন। বলেন যে পরে এই থেকে অনেক পয়সা হবে। কিন্তু অর্থের জন্য সাধনা ব্যাহত করতে জগদীশচন্দ্র রাজী হ'লেন না। একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ক্রোড়পতি মালিক একেবারে পেটেণ্ট করবার আবেদন পত্র হাতে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ইনিও সেই একই অনুরোধ করেন। বলেন যে সমস্ত ব্যয়ভার তাঁর, লভ্যাংশ আধাআধি। এবারেও তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময়ের এক চিঠিতে লিখেছেন, "সেদিন আমার বক্তৃতা শুনতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর লোক এসেছিল; তারা পারলে আমার সামনে থেকেই আমার

কল নিয়ে প্রস্থান করত! আমার টেবিলে অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তা অদৃশ্য হ'ল।"

জগদীশচন্দ্রের একজন মার্কিণ বন্ধু তাঁর নিস্পৃহ অসংসারী ভাবে বিরক্ত হয়ে, তাঁর আবিষ্কার নিজের নামে পেটেণ্ট করে নিলেন। জগদীশচন্দ্র তাতে কোন আপত্তিই করলেন না। এদিকে তাঁর নিজের পেটেণ্ট নেবার সময় ও অধিকার উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল।

১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক বিলাত যান, ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তাঁর নূতন আবিষ্কার অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। বহু বৈজ্ঞানিক সমবেত, তন্মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত লর্ড কেলভিন, অলিভার লজ, স্যর জে, জে, টমসনও আছেন। বক্তৃতা শুনে সকলেই মুগ্ধ। জগৎ সভায় বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত হলেন। লর্ড কেলভিন ও অলিভার লজ তাঁকে বিলাতেই অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র জানালেন যে ভারতের হাওয়া ছেড়ে তিনি কাজ করতে পারবেন না।

তারপর লণ্ডন রয়াল ইনষ্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হ'ন। সব চেয়ে সেরা সম্মান, খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে তা ঘটে। তাঁর বক্তৃতা শুনে লর্ড র‍্যালে বলেন, "অদ্ভুত! যেন মায়াজাল। এরূপ নির্ভুল পরীক্ষা খুব কমই দেখা যায়।"

তাঁর এই সকল বক্তৃতায় ভারত সচিব এত মুগ্ধ হ'ন যে,

পরীক্ষা ও গবেষণার সুবিধার জন্য তাঁর ছুটী আরও তিন মাস বাড়িয়ে দেন। অথচ বিলাত যাবার প্রাক্কালে ছুটী মঞ্জুর করাতে তাঁকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমে বাঙ্গলার গভর্ণর তো তাঁর যাবার কথা অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দেন, পরে বিলাত পাঠাতে রাজী হ'ন। এই ছুটীর শেষ ভাগে প্যারিস ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান। সর্ব্বত্রই তাঁর বক্তৃতার ও পরীক্ষার প্রশংসা হয়।

তাঁকে ভাল ভাবে কাজে সুযোগ দেবার জন্য লর্ড কেলভিন, লর্ড লিষ্টার, স্যর উলিয়াম র‍্যামজে প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-বৃন্দ ভারত সচিবের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত গবেষণাগার তৈরী করে দেওয়া হোক। ১৮৯৭ সালে ভারত সচিব সেই আবেদন পত্র তদানীন্তন বড়লাট লর্ড এলগিনের নিকট পাঠান। তিনি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং বাংলা সরকারকে এ বিষয় পত্র লেখেন। কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি শ্বেতাঙ্গদের এতই হীন মনোভাব ছিল যে সুদীর্ঘ ১৭ বছরেও তা কার্য্যে পরিণত হয় নি। প্রেসিডেন্সী কলেজের অসম্পূর্ণ পরীক্ষাগারে ভাঙ্গা টেষ্টটিউব নিয়েই তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছে। অবশেষে ১৯১৪ সালে যখন প্রস্তাব কার্য্যকরী হ'ল তখন তাঁর কার্য্যকাল শেষ হয়ে এসেছে।

১৮৯৭ সালে স্বদেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র এক নূতন বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। এবার তাঁর গবেষণার বিষয় হ'ল "জড় ও অচেতনের মধ্যে বৈদ্যুতিক সাড়া।" ১৯০০

সালে প্যারিস প্রদর্শনী থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিতে। এইখানেই তিনি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ্‌বিষয়ক আবিষ্কারের কথা বলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "জীব ও জড়পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা"। অর্থাৎ বৃক্ষ ও মানব জীবন একই নিয়মে পরিচালিত।

এই সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপার নিয়ে বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের শ্বেতাঙ্গ ডিরেক্টর মহাশয় যে নীচতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ করতেও লজ্জা হয়। জগদীশচন্দ্র এই নিমন্ত্রণের কথা লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণরকে জানান। তিনি জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ উৎসাহ দেন এবং ডিরেক্টর মহোদয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। তাতেই ডিরেক্টরের রাগ। কি! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। তিনি জগদীশচন্দ্রের নিকট এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন। পরে অবশ্য গভর্ণরের তাড়া খেয়ে বলেন যে, পাঠাতে তারই কি অসাধ। তবে কলেজের ক্ষতি বলেই যা আপত্তি। তা যাই হোক, নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠালে বিবেচনা করা হবে। ওদিকে জগদীশচন্দ্র তো চিঠি হারিয়ে বসেছেন। তিন মাস এই অবস্থার পর ১৯০০ সালের জুন মাসে ভারত সচিবের মঞ্জুর টেলিগ্রাম আসে। জগদীশচন্দ্র জুলাই মাসে যাত্রা করেন ও যথা সময়ে প্যারিসে পৌঁছতে সমর্থ হ'ন।

প্যারিসে তিনি পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। সেখান থেকে

লণ্ডনে। তখন তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ, তার ওপর আবার তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ চক্রান্ত, তাঁকে অপদস্থ করবার জন্য। প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা বাদানুবাদ হয়েছিল। পরে সবাই মুগ্ধ হয়ে কেবলই বলতে লাগলেন,—"এ যেন যাদুবিদ্যা! এত বিস্ময় লোকে একবারে ধারণা করতে পারবে না।" অধ্যাপক লজ প্রতিবাদ করতে এসে 'ধন্য' 'ধন্য' করতে থাকেন। পরদিনই তাঁকে বিলাতে অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু স্বদেশপ্রীতি তাঁর পথরোধ করে। ইউরোপে থেকে গবেষণার জন্য তিনি কিছু দিনের ছুটী চান কিন্তু ভারত-সচিব ছুটী দিতে অস্বীকার করেন।

এই সময় কয়েকজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তন্মধ্যে স্যাণ্ডারসন ও ওয়ালার তাঁর প্রবন্ধ আজগুবি বলে প্রকাশ বন্ধ করিয়ে দেন এবং ওয়ালার তা নিজের আবিষ্কার বলে এক কাগজে বার করেন। কিন্তু এই আবিষ্কারের কিছু কথা রয়াল ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতায় ছিল সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এটা তাঁরই আবিষ্কার বলে স্বীকৃত হয়। লিনিয়ান সোসাইটির সাহায্যে ও উদ্যোগে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার তাঁকে পুনরায় য়ুরোপে পাঠান বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর নূতন আবিষ্কার বার্ত্তা জানাতে। ইংল্যাণ্ড হয়ে তিনি আমেরিকায়ও

গিয়েছিলেন। সকলেই তাঁর আবিষ্কারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'ন। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি কয়েকটি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে স্বয়ং-লেখ যন্ত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের করোনেশন উপলক্ষে তিনি সি-এস্-আই উপাধি প্রাপ্ত হ'ন।

১৯১৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে আবার বিদেশে পাঠালেন তাঁর নূতন আবিষ্কার সমূহ জগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, কালিফোর্ণিয়া, ফিলাডেল্‌ফিয়া, টোকিও প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেক বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর প্রভূত সুখ্যাতি হয়। জাপান হয়ে ১৯১৫ সালের জুন মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগতের নিকট থেকে জয়মাল্য নিয়ে ফেরবার পর অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন

১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্রের প্রেসিডেন্সী কলেজের কার্য্যকাল শেষ হয় কিন্তু সরকার থেকে তাঁর চাকরীর মেয়াদ আরও দু' বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে ৩১ বছর অধ্যাপনার পর তিনি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সরকার তাঁকে ঐ কলেজের সম্মানীয় অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং কলেজ পরীক্ষাগারে

ইচ্ছামত গবেষণার অধিকার দেন। ১৯১৫ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হ'ন।

এই সময়ে তাঁর সুবিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কৃত হয়। এর দ্বারা গাছের বৃদ্ধি সঠিকরূপে মাপা চলে। ১৯১৭ সালে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' স্থাপিত হয়।

১৯১৯ সালে ভারত সরকার আবার তাঁকে বিদেশে প্রেরণ করেন তাঁর নবতম গবেষণা ও আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির পরীক্ষা দেখাবার জন্য। বিলাতের বিভিন্ন পত্রিকা তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সময়ে অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল্‌-এল্‌-ডি উপাধি প্রদান করেন। ১৯২০ সালের মে মাসে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য হ'ন। তাঁর পূর্ব্বে মাত্র দু'জন ভারতবাসী এই গৌরব লাভ করেছিলেন। এই বছরই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৯২৬-১৯২৭ সালে তিনি জাতিসঙ্ঘের সম্মেলনে সভ্য মনোনীত হয়ে বিদেশে যান। ১৯২৮ সালে জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভা যাত্রা করেন। এই তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা। সর্ব্বত্রই তিনি সসম্মানে সংবর্দ্ধিত হয়েছিলেন। স্বদেশে ফেরবার পথে মিশরের কৃষি-মন্ত্রীর অনুরোধে তিনি কায়রো যান ও সেখানে বক্তৃতা দেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁর সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়। ১৯৩১ সালে ১৪ই এপ্রিল

রামনাথ গোপর

মহম্মদ আফজল হুসেন

করমনারায়ণ বল

শিশিরকুমার মিত্র

কলিকাতা পৌরসভা তাঁকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তাঁকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়, পঞ্চাশ বৎসর কলেজ অধ্যাপনা করার উপলক্ষ্যে। শেষের কয়েক বছর তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর প্রাতে ৮টার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি গিরিডিতে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট খুলনা জেলার রাঢ়ুলি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয় ইংরেজী শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি গ্রামে নিজের ব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা এই বিদ্যালয়েই হয়। এখানকার পাঠ শেষ করে ১৮৭০ সালে পিতা তাঁকে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। তখন থেকেই তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না। দুরন্ত আমাশয় রোগে পীড়িত হয়ে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। দু'বছর বাড়ীতে থেকে নিরাময় হয়ে তিনি এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হ'ন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মেট্রোপলিটান (বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর) কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। সেই সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শ্রেণীতেও যোগ দেন। ১৮৮০ সালে তিনি এফ-এ পাশ করে বি-এ পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পুত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাতে অসমর্থ হ'ন। প্রফুল্লচন্দ্র বি-এ পঠদ্দশায় গিলক্রাইষ্ট

বৃত্তি লাভ করেন এবং সেই সামান্য অর্থের ওপর নির্ভর করে ১৮৮২ সালে বিলাত যাত্রা করেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন এবং ১৮৮৫ সালে বি-এস্‌সি পাশ করেন। তু'বছর পরে রাসায়নিক গবেষণার জন্য সেখানকার ডি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। তাঁর গবেষণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি "হোপ" পুরস্কার লাভ করেন। এই টাকায় তিনি আরও ছ'মাস সেখানে থেকে গবেষণা করতে পেরেছিলেন। এখানে থাকা কালে তিনি "সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" নামক এক পুস্তক রচনা করে বিলক্ষণ প্রশংসা লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। গবেষণার কঠোর সাধনায় দিনপাত করতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে তিনি আবিষ্কার করেন মার্কিউরাস নাইট্রাইট। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ প্রশংসামুখর হয়ে ওঠে। অধিক পরিমাণ পারদের সঙ্গে জল মেশানো নাইট্রিক এসিড (ঘনাঙ্ক ১'১) মেশালে ঠাণ্ডাবস্থায় প্রথমে মার্কিউরাস নাইট্রাইট পাওয়া যায়। অবশ্য সেটা পরে মার্কিউরাস নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এই আবিষ্কারের ফলে পারদ-জাত যৌগিক পদার্থ তালিকার একটি শূন্যস্থান পূর্ণ হ'ল।

১৯০৪ সালে তিনি আবার বিলাত যান। এবার গেলেন ভারত সরকারের ব্যয়ে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাগার সমূহ

পরিদর্শনের জন্য। যেখানে গেলেন সেইখানেই পেলেন বৈজ্ঞানিকবৃন্দের সহৃদয় অভ্যর্থনা। স্বদেশে ফেরার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে এ গৌরব তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হ'ন। বক্তৃতার জন্য তিনি যে পারিশ্রমিক পান তা আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন।

১৯১২ সালে তিনি তৃতীয় বার বিলাত যান বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে। এই সময়ে ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-এস্‌সি উপাধি দেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে ভারত সরকার তাঁকে 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে বিশ্ব জোড়া যাঁর খ্যাতি তাঁকে বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ স্থায়ীভাবে উচ্চ বিভাগে (ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে) উন্নীত করেন নি, চিরদিন প্রাদেশিক স্তরে (প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে) ফেলে রেখেছিলেন।

১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে তিনি সরকারের অনুমতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরের বছর সরকারী কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে

যোগ দেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এইখানেই ছিলেন।

১৯১৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হয়ে তিনি বক্তৃতা দেন, কিন্তু পারিশ্রমিক বাবদ যে অর্থ পান তা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কেই প্রত্যর্পণ করেন। এই অর্থে শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক গবেষণার জন্য "ওয়েডারবার্ণ" পুরস্কার সৃষ্ট হয়।

১৯২০ সালে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস"এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং দেশ বিদেশে বিপুলভাবে আদৃত হয়। দু'বছর পরে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব বাংলাদেশে একদল নব্য রাসায়নিক সৃষ্টি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই জগদ্বিখ্যাত, যথা,—ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ জ্ঞান রায়, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি। ডাঃ দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম ডি-এস্‌সি। আচার্য্যে ছাত্রদের গৌরবেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

তাঁর আর একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা স্থাপন। অধ্যবসায়, সততা, একনিষ্ঠতার জ্বলন্ত উদাহরণ। মাত্র ৮০০৲ টাকা পুঁজি নিয়ে ষাট বছর পূর্ব্বে এক জীর্ণ অন্ধকারময় পুরাণো বাড়ীতে সূচনা হয়েছিল অধুনা বিখ্যাত ও বিরাট বেঙ্গল কেমিক্যালের।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারত সরকারকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করে। ১৯১৯ সালে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এই সাহায্যের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তিনি স্যার পি. সি. রায় নামেই সমধিক পরিচিত হ'ন।

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উচ্চতম বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে রসায়ন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া প্রভূত যশ ও সম্মান অর্জ্জন করেন। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি দেশে যাতে ভালভাবে রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা হতে পারে, সেই দিকে মনোনিবেশ করলেন।

১৯২২ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আর্ত্ত ত্রাণকর্ত্তা রূপে দেখা দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এই কাজে তাঁর প্রিয় ছাত্রসমাজ তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপন করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হবার পর চিন্তা, কি খাবে, কি পরবে, কি করে এরা বাঁচবে। তিনি স্থির করলেন চরকায় সূতা কাটাই একমাত্র উপায়! ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ হ'ল, সূতা কাটা আরম্ভ হ'ল, তাঁত বসল। লুপ্তপ্রায় তাঁত শিল্প আবার প্রতিষ্ঠা পেল।

তার পরই এল ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যা। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার অধিকাংশ একেবারে প্লাবিত। আবার ছুটে গেলেন প্রফুল্লচন্দ্র। বঙ্গীয়

সঙ্কটত্রাণ সমিতি স্থাপিত হ'ল আর তারই মাধ্যমে পূর্ব্বের মত তিনি চরকা-মন্ত্রে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের সঞ্জীবিত করে তুললেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর এক দিক ছিল সমাজ সংস্কার। ১৯১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তার পরিচয় মেলে। হিন্দু সমাজের দুষ্টক্ষতগুলি নির্দ্দেশ করে তার প্রতিকার করতে দেশবাসীদের অনুরোধ জানান। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রচলন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ইত্যাদির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

সাহিত্যের প্রতিও তাঁর আন্তরিক টান ছিল। রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে "বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতেই তাঁর সাহিত্যে গভীর অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ রচনা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। কতদিন পূর্ব্বে তিনি বলেছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত, কিন্তু আজও বাংলা প্রদেশের শিক্ষাবিদেরা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী ইংরেজী ভাষা আঁকড়ে পড়ে আছেন!

১৯২২ সালে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯২৫ সালে তিনি

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হয়ে বক্তৃতা দেন এবং সেই উপলক্ষে পারিশ্রমিক বাবদ যে অর্থ পান, তা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেন।

পালিত অধ্যাপক পদের নিয়ম, ষাট বছর পূর্ণ হলে বিদায় গ্রহণ করা। ঠিক সময় প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কার্য্যকাল আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেন। এই পাঁচ বছরে মাহিনা বাবদ তাঁর যে ৬০,০০০৲ টাকা পাবার কথা, তা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। খাদির উন্নতির জন্য তাঁর আজীবনের সঞ্চয় ৫৬,০০০৲ টাকা তিনি উইল করে মনোনীত ট্রাষ্টিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। নিজে যাপন করেছেন চিরকাল সরল ব্রহ্মচারীর জীবন।

জাতীয় শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সেজন্য চেষ্টাও করেছেন অনেক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বহু মাসিক পত্রিকায় লিখতেন। বাঙ্গালী জাতিকে পুনর্গঠনের জন্যই যেন তিনি কলম ধরেছিলেন। কত আশার বাণী, কত উপদেশ শুনিয়েছেন, দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভাষার ওপর ভক্তি জাগাবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন। ১৯৩০ সাল থেকে তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক পত্রিকায় শেক্সপীয়ার সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯৪২ সালে তাঁর শরীর

এম, বি, সোগারকর

দেবেন্দ্রমোহন বসু

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন

ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিলে তাঁর জয়ন্তী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়। তিনি উৎসবে হেঁটে আসতে পারেন নি এতই তাঁর শরীর অসুস্থ। আরাম কেদারায় করে তাঁকে মঞ্চে এনে বসান হয়। অধিবেশনে এই তাঁর শেষ যোগদান। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই বিজ্ঞান কলেজের এক কক্ষে তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

১৮৭৫ সালের ৭ই জুন জামালপুরে উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সেইখানেই হয়। ১৮৯২ সালে তিনি হুগলী কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও 'হোয়াইট' পদক পান। এর পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং একই সঙ্গে রসায়ন ও চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ঐ কলেজ থেকে রসায়নে এম্-এ উপাধি পান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং 'মেডিসিন' ও 'সর্জ্জারী' এই দুই বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় গুডিভ ও ম্যাকলিওড পদক পান। ১৯০২ সালে এম্-ডি ও ১৯০৪ সালে শারীরবৃত্তে পি-এইচ-ডি উপাধি পান। এ ছাড়া তিনি 'কোটস্' পদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ' পুরস্কার, কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 'মিণ্টো' পদক এবং এশিয়াটিক সোসাইটির 'স্যর উইলিয়াম জোন্স' পদকও লাভ করেন।

উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে 'প্যাথলজি' ও 'মেটিরিয়া মেডিকার' শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন, পরে কলিকাতায় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের (অধুনা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) 'মেডিসিনের' শিক্ষক হয়ে আসেন। এই

পদে তিনি প্রায় কুড়ি বছর ছিলেন। এইখানে থাকাকালে তিনি প্রচুর গবেষণা করেন, তন্মধ্যে কালা-আজর প্রতিষেধক 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' আবিষ্কার তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করে তোলে। তিনি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বিশেষ রোগসমূহ (ট্রপিক্যাল ডিজইজ) সম্পর্কেও অনেক উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেছেন। রসায়নশাস্ত্রেও তাঁর প্রচুর অবদান। তবে 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং কালা-আজর সম্বন্ধে তাঁর রচিত পুস্তক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ডাঃ কার্ল মেন্স-এর জার্ম্মান ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থে কালা-আজর সম্বন্ধে অধ্যায় ১৯২৬ সালে উপেন্দ্রনাথই লিখে দিয়েছিলেন।

উপেন্দ্রনাথকে উচ্চ গবেষণা বিশেষ ক'রে 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' আবিষ্কারের জন্য সরকার 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি বহু বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 'রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনের' তিনি সভ্য ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে ভারত তথা বিশ্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল রত্ন হারিয়েছেন।

রামনাথ চোপরা

রামনাথ ১৮৮২ সালে ১৮ই আগষ্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরান-ওয়ালা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেওয়ান রঘুনাথ চোপরা। শিশুকালে রামনাথ রোগা এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলেন, তবে লেখা পড়ার ঝোঁক ছিল। ভাল ভাবেই স্কুল শিক্ষা শেষ করেন। ১৯০২ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হ'ন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান। সেখানে কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে ভর্ত্তি হ'ন এবং ছ' বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস', ১৯০৭ সালে এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস (ইংলণ্ড) এবং ১৯০৮ সালে এম-বি, বি-সি-এইচ (ক্যাণ্টাব) উপাধি পান। অতঃপর তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক ডিক্সনের পরীক্ষাগারে যোগ দেন এবং জীবদেহের ওপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ও তাদের ভেষজ গুণ সম্পর্কীয় তথ্যাদির বিজ্ঞান (ফার্মাকোলজী) বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এইখান থেকেই তিনি ১৯১২ সালে 'শ্বাসতন্ত্রের ওপর ভেষজের ক্রিয়া' নামক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন।

কেম্ব্রিজে থাকা কালেই তিনি 'সেণ্ট বার্থলমিউ' হাস-পাতালে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রতিযোগিতা-

মূলক আই-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মিলিটারী অফিসার হয়ে তিনি পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং আফগান যুদ্ধে যোগ দেন। এইভাবে বারো বছর কেটে যায়। কিন্তু যাঁর পড়াশুনা ও গবেষণায় টান, তাঁর এ জীবন ভাল লাগবে কেন? ভারতে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপিত হতে তিনি ১৯২১ সালে ফার্মাকোলজীর চেয়ারের জন্য মনোনীত হ'ন এবং ১৯৩৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। এই সঙ্গে তিনি মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজীর অধ্যাপকও নিযুক্ত হ'ন। এখানে তিনি ২০ বছর কাজ করেন এবং ১৯৪১ সালে অবসর গ্রহণ করে কাশ্মীর ষ্টেট সরকারের অধীনে মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। পরে সরকার থেকে ভেষজ গবেষণাগার স্থাপিত হ'লে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানেরও সর্ব্বময় কর্ত্রা হ'ন। ভারত সরকার তাঁর উচ্চাঙ্গ গবেষণার জন্য পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন।

১৯২২ সালে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী চার ভাগে বিভক্ত করেন:

(১) দেশীয় ঔষধ সমূহকে ব্যবহারোপযোগী করা; (২) আয়ুর্ব্বেদীয়, হাকিমী ও অন্যান্য দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীকে আধুনিক যুগোপযোগী করা; (৩) চিকিৎসার ব্যয়ভার কমিয়ে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তে আনা; এবং (৪) ভারতীয় ভেষজবিদ্যা প্রণয়ন করা।

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টররূপে এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজীর অধ্যাপক-রূপে তিনি এই কাজগুলো সুসম্পন্ন করবার বিশেষ সুবিধা পান। ১৯৪১ সালে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন সারা ভারতে তাঁর ছাত্রগণ ছড়িয়ে পড়েছেন। আচার্য্য পি, সি, রায়কে যেমন 'ভারতীয় রসায়নের পিতা' বলা হয় তেমনই চোপরাকে 'ভারতীয় ফার্মাকোলজীর পিতা' নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৩০-৩১ সালে তিনি ভারত সরকারের 'ড্রাগ এনকোয়ারী কমিটির' সভাপতি ছিলেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহসভাপতি ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতি পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি মনোনীত হ'ন। দেশী ও বিদেশী বহু বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

পঞ্চানন নিয়োগী

১৮৮৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর হুগলি জেলার হোয়েড়া গ্রামে ডাঃ নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মাইনর স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে তিনি কলিকাতায় আর্য্যমিশন স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। এইখান থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৫৲ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। ডাফ্ কলেজে এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন এবং পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ঐ পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করাতে সারদাপ্রসাদ প্রাইজ পান। সেই থেকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সকল পরীক্ষায় তিনি রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এর পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন কিন্তু পরে মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে ট্রান্সফার নেন। ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করাতে উড্রো বৃত্তি, গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণপদক ও রায় অমৃতলাল মিত্র বাহাদুর পুরস্কার পান। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন এবং ১৯০৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এম-এ পাশ করেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি একশ' টাকার সরকারী গবেষণা-বৃত্তি লাভ করেন। দু'বছর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

কাছে কাজ করে উচ্চাঙ্গ গবেষণার জন্য গ্রিফিথ্‌স মেমোরিয়াল প্রাইজ ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

তখন বঙ্গ ভঙ্গ হয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র হয়েছে। ১৯০৭ সালের ১১ই নভেম্বর তিনি রাজসাহী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। সেখানে তিনি চৌদ্দ বছর ছিলেন এবং বহু রাসায়নিক গবেষণা করেছেন। জৈব নাইট্রাইট, নাইট্রো-প্যারাফিন্স ও অ্যামিন্স সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ সালে ইণ্ডিয়ান এডুকেশানাল সার্ভিসে উন্নীত হ'ন। ১৯২১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হ'ন কিন্তু মাত্র চার মাস পরে তাঁকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ট্রান্সফার করা হয়। সেখানে চারবছর কাজ করার পর ১৯২৫ সালে স্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন।

ডাঃ নিয়োগী রসায়নশাস্ত্রের জৈব এবং অজৈব উভয় বিভাগে বহু মৌলিক গবেষণা করেছেন তবে অজৈব শাখার গবেষণাই বেশী। তিনি এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের একটি দানাদার স্বরূপ, তাছাড়া ডাইথায়োফস্‌ফেট্‌স্‌, হাইপোনাইট্রাইট্‌স্‌, ইত্যাদির নূতন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হ'ল নূতন গেলিয়াম যৌগিক

সমূহ। গেলিয়াম আবিষ্কার করেন লেকক্ ডি বই, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্ব্বেই তাঁর কথা বলেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক মেণ্ডেলিয়েফ্। রাম না জন্মাতে রামায়ণ। ডাঃ নিয়োগীর আবিষ্কারে এই ধাতুর অনেক রহস্য সরল হয়েছে।

চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে কয়েক বছর তিনি আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বর্গত স্যর পি. সি. রায়ের প্রাচীনতম ছাত্রের তিরোধান ঘটল।

দেবেন্দ্রমোহন বসু

১৮৮৫ সালের ২৬শে নভেম্বর দেবেন্দ্রমোহন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম স্বর্গত মোহিনীমোহন বসু।

দেবেন্দ্রমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা কলিকাতার সিটি স্কুলে হয়। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। এই কলেজ থেকে ১৯০৪ সালে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি-এস্‌সি পাশ করেন এবং ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যায় এম-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর এক বছর তিনি জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে যোগ দেন এবং কেভেণ্ডিশ্‌ পরীক্ষাগারে অধ্যাপক টমসনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্য্য চালান। ১৯১২ সালে রয়াল কলেজ অব সায়েন্স থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ভারতে ফিরে এক বছর তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জার্ম্মানী যান এবং দু'বছরের জন্য

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে গবেষণা করতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য তাঁর কাজে বাধা পড়ে। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। বার্লিনে থাকাকালে তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন। চৌম্বক প্রভাব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। তাঁর মতবাদ "বোস-ষ্টোলার থিওরি" নামে বিজ্ঞান জগতে পরিচিত।

দেশে ফিরে তিনি ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত পদার্থবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক রূপে কাজ করেন, পরে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রমনের অবসর গ্রহণের পর তিনি পালিত অধ্যাপক পদে উন্নীত হ'ন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পর ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং এখনও সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং সেই বছরই আগষ্ট মাসে ভোল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইটালীর কোমাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

দেবেন্দ্রমোহনের গবেষণা সমূহকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) উইলসন ক্লাউড চেম্বার (মেঘ-প্রকোষ্ঠ) নামক যন্ত্রের সাহায্যে নিউক্লিয়াসের (পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত

ধনতড়িৎ বিশিষ্ট মূল বস্তু কণিকার) সংঘর্ষ ও ভাঙ্গন। ফটোগ্রাফিক ইমালশানের সাহায্যে মেসনের * ভর নির্ণয়। (২) সরল ও জটিল চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন যৌগিক বস্তুর ধর্ম্ম। এই ধরণের বস্তুর দ্রবণে এবং স্ফটিকে রঙের উৎস। নূতন ফটো-চৌম্বক প্রভাব আবিষ্কার। (৩) জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত গাছের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা।

এতদ্বারা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* মেসন—মহাজাগতিক রশ্মিতে প্রাপ্ত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকা। এর ভর ইলেক্ট্রন ও প্রোটন কণিকার (পরমাণুর সংগঠক ঋণ তড়িৎ ও ধন তড়িৎ বিশিষ্ট কণিকা) মাঝামাঝি। মেসন কণিকায় দু'রকমেরই তড়িৎ আছে, এমন কি তড়িৎ বিহীনও হতে পারে। এর তড়িৎ শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট্রন কণিকার সমান।

প্রিয়দারঞ্জন রায়

১৮৮৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী প্রিয়দারঞ্জন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গত কালীকুমার রায়। চট্টগ্রাম কলেজে প্রাথমিক কলেজী শিক্ষার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯০৯ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। ১৯১১ সালে ঐ কলেজ থেকেই রসায়নশাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। অজৈব রসায়ন তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মতিলাল মল্লিক সুবর্ণপদক পান। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্ট রূপে কাজ করার সময় তাঁর এক বিপদ ঘটে। গরম সালফিউরিক অ্যাসিড পড়ে তাঁর বাম চক্ষু একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণ চক্ষু বাঁচে বটে কিন্তু কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক নিয়ে তাঁকে জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতার সিটি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে স্বর্গত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নশাস্ত্রে পালিত অধ্যাপকের (তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) সহকারীরূপে

যোগদান করেন। এখানে তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগে রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারারের কাজও করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ দিয়ে বিদেশে পাঠান। ইংলণ্ড ও য়ুরোপের বিভিন্ন পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন। কিছুদিন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ৺অধ্যাপক এফ্রাইমের পরীক্ষাগারে গবেষণা করেন। পরে অষ্ট্রিয়ায় ৺অধ্যাপক এমিকের মাইক্রো-কেমিক্যাল পরীক্ষাগারে (গ্রাজে) অনুবীক্ষণ রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করেন। ১৯৩২ সালের গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক মহলে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিষয় ছিল "যৌগিক পদার্থের আণবিক গঠন ও সংযোগ ক্ষমতা"।

১৯৩৭ সালে ভারতে ফিরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক এবং ১৯৪৬ সালে বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের তিনি পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন।

১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সোসাইটির আগ্রহে তিনি আচার্য্য পি. সি. রায়ের "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৯৩২ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বৎজার 'রাসায়নিক বিশ্লেষণ' সম্বন্ধে যে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন, অধ্যাপক রায় তার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ সালে ভিয়েনা থেকে

"অনুবীক্ষণ-রসায়ন" সম্পর্কে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তিনি তারও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রাজে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশানাল মাইক্রোকেমিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত নব প্রতিক্রিয়া কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৫২ সালে তিনি অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বৈশ্লেষিক রসায়নশাস্ত্রের আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হ'ন। ১৯৫৩ সালে ষ্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের ত্রয়োদশ আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে ও সপ্তদশ আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সুইডিশ ন্যাশানাল কমিটি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন।

দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেক গবেষণার ফলাফল রসায়নশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে স্থানলাভ করেছে। তাঁর বহু গবেষণার মধ্যে সায়ানোকোবাল্টিয়েট্‌স্ ও থায়োসাল-ফিউরিক এসিড সংক্রান্ত কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈশ্লেষিক রসায়নে রুবিয়ানিক অ্যাসিড, হেক্সামাইন, কুইনাল্ডিনিক অ্যাসিড ডাইমার্কাপ্টোথায়োডিয়োজোল ইত্যাদি সম্পর্কীয় গবেষণা জগদ্বিখ্যাত।

অধ্যাপক রায় বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তিনি ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফাউণ্ডেশন

ফেলো। বহু বছর ধরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়া ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্ম্মসচিবের কাজও বহু বছর ধরে করেছেন। বহুদিন ধরে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের অবৈতনিক কর্ম্মসচিব ছিলেন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা ডিরেক্টররূপে যোগদানের পর তিনি অজৈব রসায়নের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হ'ন। ১৯৫৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপক থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন

১৮৮৮ সালের ৭ই নবেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে ভেঙ্কট রমন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় ভিজাগাপত্তমের হিন্দু কলেজে। এইখানে তাঁর পিতা ছিলেন পদার্থ-বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক। পরে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ১৯০৪ সালে বি-এ এবং ১৯০৬ সালে এম-এ পাশ করেন। বি-এ পঠদ্দশাতেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে তাঁর আলোক ও শব্দ বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা বিলাতের বিখ্যাত পত্রিকা নেচার ও ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময় গবেষণার কোন সুবিধা না থাকাতে তিনি প্রতিযোগিতামূলক ফিন্যান্স পরীক্ষা দেন ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি গেজেটেড অফিসাররূপে ভারতীয় ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত হ'ন। তিনি এইখানে কাজ করেছিলেন ১৯০৭ সালের জুন থেকে ১৯১৭ সালের জুলাই পর্য্যন্ত। এর সঙ্গে নিজেও গবেষণা চালিয়ে গেছেন। ১৯০৯ সালের কথা। অফিসের কাজে তাঁকে প্রায়ই কলিকাতায় আসতে হ'ত। এক-দিন বহুবাজারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁর নজরে পড়ে। তিনি তখনই সেখানে ঢুকে পড়েন। বহুদিন তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর অবৈতনিক কর্ম্মসচিব ছিলেন। এই গবেষণাগারেই তিনি তাঁর অধিকাংশ গবেষণা করেন। এই সময়ে বিলাতের বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর প্রায় ৩০টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালে তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর মৌলিক গবেষণা সমূহ শীঘ্রই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৪ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯২৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন তার জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে গণ্য হ'ন। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পদার্থবিদ্ পিটার প্রিংশীম ১৯২৮ সালেই এই আবিষ্কারের নাম দেন "রমন এফেক্ট"। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারে অধ্যাপক রমন জৈব তরল পদার্থ দ্বারা বিক্ষিপ্ত আলোকের ধর্ম্ম সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। তিনি দেখলেন যে বিক্ষিপ্ত আলোকের বর্ণালীর মধ্যে এমন কয়েকটি নূতন রেখা রয়েছে যা আপতিত আলোকের বর্ণালীর মধ্যে ছিল না। ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে এই রেখাগুলির সরণের একটা নির্দ্দিষ্ট আবৃত্তি আছে এবং এদের সংখ্যা ও সরণ অণুর মধ্যে পরমাণুসমূহের সংখ্যা ও বিন্যাসের ওপর নির্ভর

করে। আরও গবেষণা চালিয়ে তিনি দেখলেন যে কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল পদার্থের জন্যই এই ধরণের অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। এই আবিষ্কারটি আকস্মিক নয়। ১৯২৩ সালে অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারে কাজ করতে করতে রমানাথন্ লক্ষ্য করেছিলেন যে তরল পদার্থের দ্বারা নীল আলো বিক্ষিপ্ত হলে সবুজ রঙের আলোর আভাস পাওয়া যায়। তিনি এই অতিরিক্ত সবুজ আলোককে তরল পদার্থের প্রতিপ্রভা মনে করেছিলেন। ১৯২৫ সালে ঐ একই গবেষণাগারে একই পরীক্ষার কাজ করতে গিয়ে কে, এস, কৃষ্ণণও ঐ অতিরিক্ত সবুজ আলো দেখেন এবং তিনিও তরল পদার্থের প্রতিপ্রভা মনে করেন। রমনও সেই একই গবেষণাগারে একই পরীক্ষা চালান এবং তিনিও ঐ অতিরিক্ত সবুজ আলো দেখেন। কিন্তু তিনি সেটাকে প্রতিপ্রভা মনে করেন নি। এই অদ্ভুত ঘটনার তিনি যে ব্যাখ্যা করেন তাই জগদ্বিখ্যাত "রমন এফেক্ট"। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে তাঁকে পদার্থবিদ্যায় নোবল প্রাইজ দেওয়া হয়। "রমন এফেক্ট" নিয়ে গত পঁচিশ বছরে প্রায় তিন হাজার মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। "রমন এফেক্ট" কেবল অণুর গঠন নির্দ্দেশই করেনি, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝতে এবং রাসায়নিক পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয়েও সাহায্য করেছে। আণবিক গঠনে আন্তরাণবিক শক্তি ক্ষেত্রের প্রভাব সম্পর্কেও অনেক খবর দিয়েছে। আরও দেখিয়েছে যে, এমন অনেক পদার্থ আছে

যাদের কঠিন অবস্থায় বর্ণালীর মধ্যে এমন নূতন কয়েকটি রেখা দেখতে পাওয়া যায় যা তরল অবস্থার বর্ণালীর মধ্যে ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে, একই অণুর তরল ও কঠিন অবস্থায় আন্তরাণবিক ক্ষেত্র বিভিন্ন এবং অণুর মধ্যে মূলগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে। এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় বুনিয়াদ স্বরূপ। বিজ্ঞান জগতের একেবারে উচ্চতম আবিষ্কার সমূহের অন্যতম।

এই আবিষ্কারের জন্য ১৯২৯ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে 'স্যর' উপাধি দেন। ১৯২৮ সালে ইটালিয়ান সোসাইটী অব সায়েন্স প্রদান করেন ম্যাটেউকি পদক আর ১৯৩০ সালে রয়াল সোসাইটী তাঁকে পুরস্কৃত করেন হিউগ্‌স্‌ পদক দিয়ে। ১৯৩০ সালে জগদ্বিখ্যাত দুর্ল্ভ নোবল প্রাইজ তো পেলেনই, তাছাড়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় অনারারী ডি-এস্‌সি, গ্লাসগো এল্-এল্‌ডি, ফ্রেইবার্গ পি-এইচ-ডি, এবং কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, বারাণসী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডি-এস্‌সি উপাধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

গ্লাসগোর রয়াল ফিজিক্যাল সোসাইটি, জুরিক ফিজিক্যাল সোসাইটি, মিউনিকের ডয়েট্‌সে আকাদেমী, হাঙ্গারীর সায়েন্স আকাদেমী, ভারতের রাসায়নিক ও গাণিতিক সোসাইটি ইত্যাদি বহু দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের তিনি অনারারী ফেলো। এছাড়া বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়াল্টেয়ার অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক।

আলোক সম্পর্কে তাঁর যেমন মূল্যবান গবেষণা, ঠিক তেমনই মূল্যবান গবেষণা করেছেন শব্দবিজ্ঞান সম্পর্কে। ১৯০৯-১১ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'মেল্ডির পরীক্ষা' সম্পর্কে নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তার সাহায্যে কম্পনের মূলধর্ম্ম বিষয়ক গবেষণা চালান। তিনি দেখান যে, কম্পিত তারের 'নোড' গতিহীন স্থিতিবিন্দু নয়, ঈষৎ গতিযুক্ত; কারণ তারের গতির জন্য যে যে শক্তির প্রয়োজন তা এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নোডে এই গতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিনি সবিরাম আলোকের ব্যবস্থা করেন। আলোকের কম্পাঙ্ক তারের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ। এই অবস্থায় তারে যে বিশেষ ছ'টি স্থানের সৃষ্টি হয়, সেখানে ধীরে গতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রকৃত গতির বিপরীত দশায় থাকে। তিনি দেখান নোডের এই ধীরগতির দশা অবশিষ্ট তারের কম্পন থেকে এক-চতুর্থাংশ ভিন্ন হয়। এই গবেষণা ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'মেল্ডির পরীক্ষা' সম্পর্কে তিনি নূতন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "তুই কম্পাঙ্কযুক্ত বলের সাহায্যে কম্পন সংস্থাপন সম্পর্কে র‍্যালের সিদ্ধান্তে ও পরীক্ষালব্ধ ফলে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।" র‍্যালের সূত্র হচ্ছে "গতির দশা সংস্থাপিত বিস্তার নিরপেক্ষ এবং এই বিস্তার অনির্ণেয়।" পরীক্ষা দ্বারা রমন প্রমাণ করেন যে, গতির দশা যে কোন প্রাথমিক টানের অধীনে সংস্থাপিত বিস্তারের নিরপেক্ষ নয় কারণ মুক্ত কম্পনের বিস্তারের সঙ্গে টানের পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান এবং এই পরিবর্ত্তন গতির

বর্গরাশির সমানুপাত। তাঁর এই গবেষণা ১৯১১ সালের মে মাসে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

অনুনাদ সম্পর্কেও তিনি নূতন তথ্য নির্ণয় করেন। অনুনাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, কোন একটি ব্যবস্থার ওপর পর্য্যাবৃত্ত বলের ক্রিয়ায় যদি পর্য্যায়কাল সমান হয়, তবে অত্যন্ত অল্প গতির বিস্তার সংস্থাপিত হতে পারে। অন্যান্য অবস্থায় এই পরিমাণ এত অল্প যে গণনার মধ্যেই আসে না। রমন দেখান যে, অনুনাদের এমন অনেক অবস্থা আছে যেখানে দীর্ঘ গতির বিস্তার হতে পারে। এই গবেষণা ১৯১২ সালে "ফিজিক্যাল রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বেহালা জাতীয় ছড় টানা তারের যন্ত্রে এমন স্বর আছে যা ইচ্ছামত সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। এই স্বর আপনিই মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে। এই বিশ্রী কর্কশ স্বরকে "উল্‌ফ নোট" বা নেকড়ে স্বর বলে। যখন এই স্বর নির্গত হয়, তখন সমস্ত যন্ত্রটি প্রবল ভাবে কম্পিত হতে থাকে। এই অবস্থায় তারে ছড় টানা যায় না এবং স্পষ্ট মধুর সুরও বার করা যায় না। ১৯১৬ সালে 'নেচার' পত্রিকায় এবং ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে রমন এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, যন্ত্রের (কাঠের) সানুকম্পের জন্য তারের কিছুটা শক্তি ক্ষয় হয়; ফলে ছড় ও তারের মধ্যে চাপ কমে যায়। তার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছড় প্রাথমিককে প্রধানরূপে সংস্থাপন করতে পারে, শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ সেই

সীমাকেও ক্রমে অতিক্রম করে বেড়ে চলে। পরে কাঠের কম্পনের নিবৃত্তি হলে প্রাথমিক প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, সরল একতান বল লম্বালম্বিভাবে টানা তারের ওপর পরিচালিত হয়ে যখন তারের মুক্ত দোলনের কম্পাঙ্ক ফর্কের (এক প্রকার চিমটা জাতীয় যন্ত্র) কম্পাঙ্কের অর্দ্ধের যে কোন গুণিতকের প্রায় সমান হয়, তখনই কম্পন সংস্থাপন করতে পারে। এই গবেষণা করেন ১৯১১-১২ সালে।

এছাড়া 'সম্মিলিত', 'সঙ্কলিত', 'বিভেদক' ইত্যাদি বহু রকমের অনুনাদ সম্পর্কে তিনি অনেক নূতন কথা বলেন। ১৯১৮ সালে উচ্চ গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি অনুনাদ সম্পর্কে একটি সরল নিয়ম উদ্ভাবিত করেন।

১৯২০ সালে তিনি টানা তারের ধর্ম্ম সম্পর্কে পরীক্ষা চালান এবং হেল্‌মহোল্‌জের ও কফ্‌ম্যানের তথ্য সংশোধিত আকারে প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স গির্জ্জায় সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে বিখ্যাত 'হুইস্পারিং গ্যালারী'তে অনুনাদ সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। এ বিষয়ে র‍্যালে কিছু কাজ করেছিলেন। র‍্যালে কৃত অংশের সত্যতা প্রমাণ করেন আর যা বাকী ছিল তা সম্পূর্ণ করেন। তার পরবর্ত্তী গবেষণা 'বলের পর্য্যাবৃত ক্ষেত্রে গতি' সম্বন্ধীয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক এই ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের সমান অথবা অর্দ্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ প্রভৃতি, অর্থাৎ ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের যে কোন ভগ্নাংশের গুণিতকের সমান।

তিনি এক নূতন ধরণের অনুনাদ কম্পনের শ্রেণী নির্ণয় করেছেন এবং এর গাণিতিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

১৯৩২ সাল 'আল্‌ট্রাসোনিক ওয়েভ' * সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই শব্দ তরঙ্গ তরলের মধ্যে দিয়ে যায় এবং এর ওপর আলোকরশ্মি ফেললে শব্দ তরঙ্গ বেঁকে যায়, অনেকটা কৃষ্ট্যাল (স্ফটিক) দ্বারা এক্স-রে'র অপবর্ত্তনের মত। ১৯৩৫ সালে তিনি এর কারণ এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক রমন সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বিদেশের গবেষণাগারসমূহে শিক্ষালাভ না করেও কেবল নিজের চেষ্টার ফলে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯২১ সালে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বৃটিশ এম্পায়ার বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে কানাডা ভ্রমণকালে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স কর্ত্তৃক বিলাতে আমন্ত্রিত হন এবং টরণ্টোতে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ও গণিতজ্ঞদের আন্তর্জ্জাতিক কনফারেন্সে "আলোকের বিক্ষেপন" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এর পর ফিলেডেলফিয়ায় ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটের শত বার্ষিক উৎসবে

* যে শব্দ তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০ বারের বেশী, তা মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। একে আল্‌ট্রাসোনিক বা সুপারসোনিক ওয়েভ বলে।

যোগদানের জন্য ভারতের প্রতিনিধিরূপে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। মিলিকানের ক্যালিফোর্ণিয়া টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ভিজিটিং অধ্যাপকরূপে প্যাসেডেনাতে চার মাস অবস্থান করেন। রুশিয়ার আকাদেমী অব সায়েন্সেস্ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের প্রতিনিধিরূপে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড আকাদেমীর দ্বি-শত বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করবার জন্য ১৯২৫ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন। "আণবিক বর্ণালি" সম্বন্ধে আলোচনা উদ্বোধন করবার জন্য ১৯২৯ সালে ফ্যারাডে সোসাইটি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং এই উপলক্ষে ইউরোপের বহু গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও বক্তৃতা দেন। এর পর নোবেল প্রাইজ উপলক্ষে ১৯৩০ সালে, প্যারিসে ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ উপলক্ষে ১৯৩২ সালে, প্যারিস এবং বলোগ্নায় আন্তর্জ্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেস উপলক্ষে ১৯৩৭ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান ফ্র্যাঙ্কলিন পদক লাভ করেন।

১৯০৭ সালের জুন থেকে ১৯১৭ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয় ফিন্যান্স বিভাগে গেজেটেড অফিসাররূপে কাজ করেন। ১৯১৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের-এর ডিরেক্টর

ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি এখন স্বাধীন ভাবে নিজ গবেষণাগারে কাজ করছেন। মুক্তোর ওপর "রমন এফেক্ট" তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে স্বাধীন ভারতের সর্ব্বোচ্চ সম্মান "ভারত রত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহম্মদ আফজল হুসেন

১৮৮৯ সালে পাঞ্জাবের বাটালা গ্রামে আফজল হুসেন জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরে গভর্ণমেণ্ট কলেজে তিনি শিক্ষা পান। প্রাণিবিদ্যায় অনার্স নিয়ে তিনি ১৯১১ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস্‌সি পাশ করেন এবং ১৯১৩ সালে এম-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১১-১২ সালে তিনি অ্যালফ্রেড পাতিয়ালা বৃত্তি এবং ১৯১২-১৩ সালে কলেজের বৃত্তি পান। এর পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। এইখানেই তাঁর বড় ভাই স্যর ফজলি হুসেন শিক্ষালাভ করেছিলেন। আফজল সেখানে 'ট্রাইপস' উপাধি লাভ করেন; প্রথম অংশে তাঁর বিষয় ছিল উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবৃত্ত ও প্রাণিবিদ্যা এবং দ্বিতীয় অংশে ছিল প্রাণিবিদ্যা। দ্বিতীয় অংশে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পান। ১৯১৪-১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিভিন্ন বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে প্রাণিবিদ্যায় সর্ব্বোত্তম ছাত্র পরিগণিত হওয়ায় তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্র্যাঙ্ক স্মার্ট পুরস্কার লাভ করেন। মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি চার্লস ডারউইন পুরস্কারও পান। গবেষক হিসাবে তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জ্জন করেন। কলেজ, লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি,

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বালফুর গবেষণা ভাণ্ডার এবং ভারত সচিবের দপ্তর থেকে তিনি বৃত্তিলাভ করেন। কিছুদিন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ডেমনষ্ট্রেটরের কাজও করেছিলেন।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারত সচিব কর্ত্তৃক ইম্পিরিয়াল কৃষি বিভাগে পতঙ্গবিদের পদে মনোনীত হন এবং ভারতে ফিরে পুসায় ইম্পিরিয়াল কৃষি গবেষণাগারে যোগ দেন। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পাঞ্জাব সরকারের পতঙ্গবিদ্ ও লায়ালপুরে পাঞ্জাব কৃষি-কলেজের প্রাণিবিদ্যা ও পতঙ্গবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৫-২৬ সালে তিনি আবার পুসায় যান পতঙ্গবিদ্যা বিভাগের কর্ত্তা হয়ে। ১৯৩০-৩৩ সালে তিনি কৃষি গবেষণাগারে পঙ্গপাল সম্পর্কে গবেষণা করেন। তারই ফলে ভারতে পঙ্গপালের উপদ্রব থেকে বাঁচবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে তিনি লায়ালপুরে কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অধ্যাপক আফজল হুসেন পাঞ্জাব সরকারের সর্ব্বপ্রথম পতঙ্গবিদ এবং তাঁরই চেষ্টায় ভারতে পতঙ্গবিদ্যা উন্নতি লাভ করে। ভারতের পতঙ্গবিদ্যা সোসাইটির তিনিই জন্মদাতা। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞান ও কৃষি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহুদিন তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য ও কৃষি বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

১৯৩৮ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হন এবং তিন বছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়েই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের জন্য সঙ্গীত ও কলা বিভাগ এবং সাধারণের জন্য পরিসংখ্যান ও সম্পাদকতা বিভাগ খোলা হয়।

অধ্যাপক হুসেন ভারতীয় ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের আদি সদস্যদের অন্যতম ও কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি ভারতের ন্যাশানাল আকাদেমী অব সায়েন্সেরও ফেলো। ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ১৯৩৩ সালে কৃষিবিদ্যা বিভাগের এবং ১৯৩৮ সালে পতঙ্গবিদ্যা বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কংগ্রেসের মূল সভাপতি পদে মনোনীত হ'ন। ১৯৩৫ সালে মিশরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক পঙ্গপাল নিবারণী কংগ্রেসে এবং ১৯৩৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত কৃষি কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে কৃষি কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১৯৪৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজে অবসর নিয়ে তিনি বঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে কৃষি বিভাগের উপদেষ্টা হয়ে বাংলায় আসেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ওয়ার মেমোরিয়াল কমিটির সভ্য ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালে এই কমিটির প্রতিনিধিরূপে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আকাদেমী সমূহ পরিদর্শন করতে যান।

করমনারায়ণ বল

১৮৯১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মুলতান শহরে (অধুনা পশ্চিম পাকিস্থানে) করমনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে তিনি ১৯১৩ সালে প্রাণিবিদ্যায় প্রথম বিভাগে এম-এস্‌সি পাশ করেন। এম-এস্‌সি পঠদ্দশায় তিনি কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন এবং পাশ করবার পর ঐ কলেজেই তিনি প্রাণিবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি আগ্রার সেণ্ট জোন্স কলেজে প্রাণি-বিদ্যার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে তিনি এলাহাবাদের ম্যুইর সেণ্ট্রাল কলেজে প্রাণিবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত এইখানে থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে যান। তৎপূর্ব্বে তিনি কেঁচোর রেচন-তন্ত্র সম্পর্কে এক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেছিলেন। ১৯২০ সালে এই প্রবন্ধের জন্য তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস্‌সি উপাধি পান। ১৯২১ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল্‌ উপাধি লাভ করেন। অক্সফোর্ডে থাকাকালে তিনি সেখানকার প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ডেমনষ্ট্রেটরের কাজও করেছিলেন। ১৯২১ সালে ভারতে ফিরে তিনি নব স্থাপিত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা

বিভাগের রীডার ও ডীন নিযুক্ত হ'ন। ১৯২৩ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হ'লে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে মৌলিক গবেষণার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁর কাজের সুবিধার জন্য লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে গবেষণাগার যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার দেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হয়ে চলে যান। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়াতে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই কার্য্যভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ন।

অধ্যাপক বল ১৯২৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাণিবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন। এলাহাবাদের ন্যাশানাল আকাদেমী অব সায়েন্সেস্ স্থাপনার সময় থেকে তিনি তার ফেলো মনোনীত হ'ন। ১৯৩১-৩৩ সালে তিনি এই আকাদেমীর সভাপতি ছিলেন। ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্ স্থাপনার সময় থেকে তিনি ফেলো এবং ১৯৫১-৫৩ সালে তিনি এই ইনষ্টিটিউটের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬-৩৮ সালে তিনি এলাহাবাদের বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিরও ফেলো ছিলেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত করার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। ভারতীয় জুলজিক্যাল

সোসাইটি স্থাপনা ও উন্নতিকল্পে তাঁর সাহায্য ও প্রচেষ্টা অতুলনীয়। তিনি গোড়া থেকেই এর ফেলো ছিলেন। সোসাইটির পত্রিকার তিনিই সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৫০-৫১ সালে সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য তিনি ১৯৪২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির 'জয় গোবিন্দ লাহা স্মৃতি' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে বিলাতে ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী ও গবেষণার ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবার জন্য। এই সময় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা-মন্দিরে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হ'ন। ১৯৪৮ সালে বীরাটে অনুষ্ঠিত 'ইউনেস্কো' কনফারেন্সে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি ভারত সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

১৯৫৪ সালের ২১শে এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

বীরবল সাহনি

করমচাঁদ মেহতা

শিশিরকুমার মিত্র

শিশিরকুমার ১৮৯০ সালে অক্টোবর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা হয় ভাগলপুরে ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম্-এস্‌সি পাশ করেন ও স্তুবর্ণ পদক পান। তারপর তিনি বিহার ও বাংলার বিভিন্ন কলেজে কয় বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর বিভাগে পদার্থবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হ'ন। তৎকালীন পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক ডাঃ রমনের অধীনে গবেষণার কাজ ক'রে ১৯১৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস্‌সি উপাধি পান। তারপর তিনি যান প্যারিসে। সেখানে সর্ব্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফাব্রির অধীনে গবেষণা চালিয়ে ১৯২৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। অতঃপর কিছুদিন তিনি মাদাম ক্যুরির অধীনে ইনষ্টিটিউট অব রেডিয়ামে কাজ করেন। তারপর তিনি ন্যান্সির ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সে যোগদান করেন এবং অধ্যাপক গটনের অধীনে রেডিও সম্পর্কীয় উচ্চ গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

১৯২৩ সালে স্বদেশে ফিরলে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৫ সালে

থেকে তিনি পদার্থবিদ্যার স্যর রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯৩৫ সালে তিনি বিলাত যান সেখানকার রেডিও বিজ্ঞান শিক্ষাপদ্ধতি ভাল ভাবে দেখে আসতে। সেখানকার বৈজ্ঞানিক-বৃন্দ তাঁকে খুব উৎসাহ দিলেন ভারতে রেডিও সম্পর্কীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কাজে। ভারতে ফিরেই তিনি এই সম্পর্কে এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ সাহায্য করতে রাজী হ'ন না। কিন্তু তিনি চেষ্টা ছাড়লেন না। ১৯৪২ সালে তাঁর স্বপ্ন সফল হ'ল। ভারত সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কমিটি রেডিও সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য একটি বিভাগ খুললেন।

১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দলের সভ্য হয়ে যুক্ত-রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে যান। যুদ্ধেরজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই দেশে রেডিও বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে যান। ১৯৪৫ সালে দেশে ফিরে এসেই তিনি কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তার ফলে প্রথমে বেতার একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পদার্থবিদ্যার এম-এসসি পাঠ্যতালিকায় ভুক্ত হয়। তিনি অতঃপর স্বাধীনভাবে বেতার ও ইলেকট্রনিক্সে এম-এসসি কোর্স প্রবর্ত্তনের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। কর্ত্তৃপক্ষ এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও অর্থাভাবে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। অধ্যাপক মিত্রের স্কীম কেবল বিভিন্ন কমিটি এবং

বোর্ডে ঘোরা-ঘুরি করতে থাকে। শেষে ১৯৪৫ সালে সরকারী সাহায্য পেয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হ'ল। তিনিই এই বিভাগের সকল ভার পেলেন। অর্থাৎ তাঁকে পদার্থবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপকের কাজ এবং রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্সের যে ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হ'ল তার কর্ম্মকর্ত্তার কাজ একই সঙ্গে করে যেতে হ'ল। অধ্যাপনা এবং গবেষণা তুইই।

শিশিরকুমার প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আলোকরশ্মির তরঙ্গ বিশ্লেষণ (diffraction) সম্পর্কে। পারিসে সার্ব্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০-২৩০০ A. U. এর মধ্যে সমাঙ্ক বর্ণালীর প্রমাণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্পর্কে গবেষণা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রেডিও ভ্যাল্‌ভের উন্নতি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেই থেকে তিনি রেডিও বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। বেতার বার্ত্তা চলাচলের সঙ্গে তড়িতাবিষ্ট বায়বীয় স্তরের (ionosphere) এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হ'লে অপরটির সম্বন্ধেও জানতে হয়। তাই তাঁকে এই সম্পর্কে গবেষণাও আকৃষ্ট করল। ১৯৩১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হ'ন আয়ানোস্ফিয়ার সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। তাঁর বক্তব্য "তড়িতাবিষ্ট বায়বীয় স্তর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ও বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। ১৯৪৮ সালে তিনি "উচ্চতর বায়ু-স্তর" সম্পর্কে একটি বিশদ পুস্তক রচনা করেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পুস্তক

আদৃত হয়। বায়ু-স্তর সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে তিনি আকৃষ্ট হ'ন রাতের আকাশের ক্ষীণ দীপ্তির দিকে আর তাই থেকে এগিয়ে যান নাইট্রোজনের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক ডিস্‌চার্জ্জ-জনিত প্রভার দিকে। তিনি বলেন যে, এই প্রভার কারণ সক্রিয় নাইট্রোজেন। তাঁর এই নতুন তথ্য ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এখন সর্ব্বজন স্বীকৃত।

তাঁর এই উচ্চাঙ্গের গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক দামী একটি আয়োনোস্ফিয়ার-মাপক যন্ত্র উপহার দেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় এই যন্ত্র বসান হয়েছে এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার অর্থানুকূল্যে এখানে কাজ হচ্ছে।

অধ্যাপক মিত্র ছিলেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার রেডিও রিসার্চ্চ বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান (১৯৪৩-৪৮); বঙ্গীয় শিল্প নির্দ্দেশক কমিটির সভ্য (১৯৩৮-৪১); ভারত সরকারের শিল্প-গবেষণা নির্দ্দেশক কমিটির সভ্য (১৯৩৪-৩৬); ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি (১৯৩৪), মূল সভাপতি (১৯৫৫) এবং কর্ম্মসচিব (১৯৩৯-২৩); ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি (১৯৫০-৫২); এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৫১-৫৩); ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এয়ারোনটিক্স এবং ইলেক্ট্রনিক্সের সভাপতি (১৯৫৩)।

বীরবল সাহনি

১৮৯১ সালের ১৪ই নভেম্বর পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেরা গ্রামে বীরবল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গত রুচিরাম সাহনি পাঞ্জাবের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন।

বীরবলের সমস্ত শিক্ষা লাহোরে হয়। সেখানকার গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় এম-এস্‌সি পাশ করেন। ১৯১১ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং সেখানকার ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি এম্যানুয়েল কলেজে যোগ দেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক স্যর এলবার্ট সিওয়ার্ডের অধীনে গাছ-গাছড়ার অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯২০ সালে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস্‌সি উপাধি পান; পরে ১৯২৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে এস্‌সি-ডি উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৯ সালে স্বদেশে ফিরে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। পরের বছরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার

অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৩ সালে যখন সেখানে ভূবিদ্যার ক্লাস খোলা হয়, তখন তিনি সেই বিষয়েরও অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বহু বছর ধরে তিনি লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই তিনি উদ্ভিদকুলের প্রত্নজীববিদ্যা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন ও ভারতে ফিরেও করতে থাকেন। গ্লোসপ্টেরিস উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ও ফলাফল জগতের সকল বৈজ্ঞানিকরাই মেনে নিয়েছেন। তাঁর শিলিভূত উদ্ভিদকূল সম্পর্কে গবেষণাও যুগান্তকারী। এর থেকে তিনি পৃথিবীর বয়স এবং তার পূর্ব্বাবস্থা, দেশ-বিদেশের মধ্যে পৌরাণিক দিনের যোগাযোগ ইত্যাদি নির্ণয় করেন।

অধ্যাপক সাহনি ভারতের এবং বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন এবং বহু বছর ধরে সোসাইটির পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯২১ ও ১৯৩৮ সালে উদ্ভিদবিদ্যা শাখার, ১৯২৬ সালে ভূবিদ্যা শাখার এবং ১৯৪০ সালে মূল সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী ও ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জ্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসে উদ্ভিদ-কুলের প্রত্নজীববিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ঐ বছরেই

প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের তৃতীয় শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হ'ন এবং বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটির 'বার্কলে' পদক লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে ভারত সরকার তাঁকে য়ুরোপ, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারসমূহ প্রদর্শন করতে পাঠান। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জ্জাতিক ভূবিদ্যা কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে ষ্টকহল্মে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জ্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের তিনি চেয়ারম্যান মনোনীত হ'ন কিন্তু যোগ দিতে পারেন নি।

১৯৪৯ সালের ১০ই এপ্রিল তিনি হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন।

নীলরতন ধর

১৮৯২ সালের ২রা জানুয়ারী যশোহর নগরে নীলরতন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গত প্রসন্নকুমার ধর সেখানকার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। নীলরতনের প্রাথমিক শিক্ষা যশোহর জিলা স্কুলেই সম্পন্ন হয়। সেখান থেকে ১৯০৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। কলিকাতার রিপণ কলেজ থেকে ১৯০৯ সালে প্রথম বিভাগে আই-এস্‌সি পাশ করে ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। এবার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন এবং ১৯১১ সালে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় রসায়নে অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাশ করেন। ১৯১৩ সালে ঐ কলেজ থেকেই রসায়নে এম-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। সেই বছরের এম-এ ও এম-এস্‌সি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ৫০০৲ টাকার পুরস্কার ও অনেকগুলি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তা ছাড়া গ্রিফিথ মেমোরিয়াল ও জুবিলী প্রাইজ এবং এসিয়াটিক সোসাইটির "ইলিয়ট" পদকও পান।

১৯১১ সাল থেকেই তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। এখন পালিত গবেষণা বৃত্তি পেয়ে পুরোপুরি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই

সময় ভারত সরকারের ষ্টেট্স্ স্কলারশিপ পেয়ে ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে কেবল দেড় বছর গবেষণা করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। ১৯১৯ সালে যুক্তরাজ্যের রসায়ন ইনষ্টিটিউট তাঁকে সভ্য মনোনীত করেন।

১৯১৭ সালে তিনি প্যারিসে যান 'ষ্টেট-ডক্টরেট' উপাধি লাভের জন্য। মাত্র সওয়া এক বছর গবেষণা করে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ২৭ বছর বয়সে সাফল্য লাভ করেন। অধ্যাপকেরা মুগ্ধ হয়ে যান। সেখানে থাকতেই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হ'ন রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য। ১৯১৯ সালে স্বদেশে ফিরে তিনি সেই কাজে যোগদান করেন এবং এখনও সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

তাঁর গবেষণাকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যায়:

(১) ক্যাটালিসিস্—রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া। যে পদার্থের জন্য তা সম্ভব হয় তাকে ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটক বলে; যেমন ছত্রাক জাতীয় এক রকম জৈব পদার্থ ঈষ্টের সাহায্যে চিনি অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

(২) কোলয়েড—দ্রাব্য ও দ্রাবক যদি পৃথকও না থাকে আবার অনুগুলি ওতপ্রোতভাবে মিশেও না যায়, তবে এই দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দ্রাব্যপদার্থকে কোলয়েড বলে।

(৩) বায়োকেমিষ্ট্রী—জৈব রসায়ন-শাস্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন জৈব পদার্থের রাসায়নিক গঠন, পরিবর্ত্তন ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

(৪) রসায়ন প্রক্রিয়ার ওপর আলোক রশ্মির প্রভাব।

ডাঃ নীলরতন স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এলাহাবাদে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন।

১৯২৬ সালে তিনি এডিনবরা ও গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৯৩১ সালে তিনি আবার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর নবতম গবেষণার কথা জানান। কৃষি সম্পর্কে ও গুড়ের সাররূপে ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ভারতের কৃষি বিভাগের উন্নতিকল্পে বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছে।

করমচাঁদ মেহতা

১৮৯২ সালের ২০শে জুন করমচাঁদ অমৃতসর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছ' বছর লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে পড়ে ১৯১৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এম-এস্‌সি ডিগ্রী অর্জ্জন করেন। পাশ করে কিছুদিন ঐ কলেজেই উদ্ভিদবিদ্যার ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হ'ন। পরে লাহোরের দয়াল সিং কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার লেকচারার হ'ন। তারপর লাহোরের ইসলামিয়া কলেজে যোগ দেন। ১৯১৫ সালে তিনি আগ্রা কলেজে উদ্ভিদ-বিদ্যার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হ'ন এবং অধ্যাপক ব্রুক্সের অধীনে গবেষণা করে পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে ভারতে ফিরে তিনি আগ্রা কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণার কাজও চলতে থাকে। ১৯৪৩ সালে "গমের রোগের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক" নামক উচ্চাঙ্গের গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এস্‌সি-ডি উপাধি প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, বায়ুর গতি এবং আর্দ্রতার জন্য গমের এক রকম রোগ হয়; তাতে গমের শীষে মরচে ধরার মত লাল লাল দাগ হয় এবং গমের প্রাণশক্তি ও খাদ্যমূল্য

নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগকে গমের মরচে বলা হয়। এর কারণ একধরণের ছত্রাক জাতীয় বীজগুটি। ১৯৪৫ সালে তিনি আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হ'ন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ছিলেন।

গমের রোগ সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হ'ন। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং তাঁর গবেষণার ফলাফল ভারতের গাছগাছড়ার রোগ সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রন্থ হয়ে আছে। ১৯২৩ সাল থেকে ৭ বছর তিনি এই গবেষণা চালান নিজের অর্থব্যয়ে। ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। এইখানে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের কানেও তা যায় ও তাঁরা মুগ্ধ হ'ন। ১৯৩০ সাল থেকে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সংস্থা তাঁকে সাহায্য করেন। শিমলা শৈলাবাসে এক গবেষণাগার স্থাপিত হয়। আগ্রা কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে গবেষণা করার সুযোগ সুবিধা দেন। তাঁকে প্রায়ই শিমলা গিয়ে থাকতে হ'ত। সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর এই গবেষণা ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের পত্রিকায় ১৯৪০ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি দেখান যে গমের রোগ গরমে হতে পারে না, বীজগুটি আপনিই ধ্বংস হয়ে যায়। রোগের কারণ হচ্ছে সেই সকল বীজগুটি যা বায়ুতাড়িত হয়ে নেপাল, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের

পাহাড়ী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল স্থান থেকে গ্রীষ্মকালে আসে। আর দক্ষিণাত্যের গমের রোগের জন্য দায়ী নীলগিরি ও পালনি পাহাড় থেকে গ্রীষ্মকালে বায়ুতাড়িত বীজগুটি। গমের এ রোগ পৌণঃপৌণিক। তিনি বলেন যে, এই রোগ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হল পাহাড়ী এলাকায় একবার গম ও বার্লি এবং পরের বার যব ও জোয়ার বোনা। গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্যদেশে গম ও বার্লি বোনা উচিত নয়। ভারত সরকার তাঁর গবেষণা অনুসারে ১৯৪৮ সালে আইন করেন। ১৯৫১ সালে ফলাফল দেখে দেশবাসীরা আনন্দিত হয়, কারণ সেবার গমের কোন রোগ হয় নি। কিন্তু যাঁর জন্য এই সফলতা তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল আগ্রা সহরে ৫৮ বৎসর বয়সে করমচাঁদ পরলোক গমন করেন।

ডাঃ মেহতা স্বদেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্রই সম্মান পেয়েছেন। ১৯৩০ সালে কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জ্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতে ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স স্থাপনার সময় থেকেই তিনি ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতীয় বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি মনোনীত হ'ন। ১৯৪৯ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে উচ্চগবেষণার জন্য বার্কলে স্মৃতিপদক প্রদান করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সালের ২৩শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় যখন মারা যান তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ খুব ছোট। অল্প বয়স থেকেই তাঁকে হতে হয়েছিল আত্মনির্ভরশীল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে রসায়নশাস্ত্রে এম-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর সতীর্থ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (এখন স্যর) ঐ বছরই নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তৎকালীন পালিত অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহকারীরূপে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে যখন স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয় তখন তিনি রসায়নের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগারে অধ্যাপক ডনানের অধীনে গবেষণা করে ১৯২১ সালে সেখানকার ডি-এস্‌সি উপাধি পান। স্বদেশে ফিরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের গুরুপ্রসাদ সিং অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে ঘোষ অধ্যাপক পদে উন্নীত হ'ন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গবেষণা আরম্ভ করেন ১৯১৪ সাল থেকে। তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কোলয়েড রসায়ন। ভারতে ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে গবেষণা হয় নি। কোলয়েডের মধ্যে তড়িৎ উদ্ভব একটি জটিল

সমস্যা আর এর সুষ্ঠু উত্তর দেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ১৯২০ সালে ২৯শে অক্টোবর বিলাতের ফারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে তিনি এই সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্য পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন, বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার' তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "সমগ্র আলোচনার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রবন্ধের অবতারণা করেন, এবারকার অধিবেশনে সেটিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক জিগ্‌মণ্ডী তাঁর কোলয়েডের তড়িদ্ধর্ম্ম সম্পর্কীয় প্রামাণিক গ্রন্থে লিখেছেন যে "ব্রেডিগ, ফ্রয়েণ্ডলিক, মিকাইলিস ফায়ান্সে ও মুখার্জ্জীকে রসায়নের এই বিভাগের নির্ম্মাতা বলা যায়।"

তাঁর গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে এবং তৈল নিষ্কাশন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সাহায্য পেয়ে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী তাঁকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা উপহার দেন। তিনি সেই অর্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেন বিজ্ঞান কলেজে কোলয়েড গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অর্থ প্রদান করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভারতের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদের উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, যথা,—ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি প্রভৃতি। ১৯৩৫ সালে

আন্তর্জ্জাতিক সয়েল সায়েন্সের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫০ সালের চতুর্থ অধিবেশনে তিনি সহ-সভাপতি রূপে যোগ দেন।

তিনি জার্ম্মানীর কোলয়েড রসায়ন সম্পর্কীয় এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। বহু বিদেশী রাসায়নিক এবং বৈজ্ঞানিক সমিতির তিনি সভ্য। যুক্তরাজ্য, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদিতে গিয়েছেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে। ১৯৪৪ সালে সরকার তাঁকে সি-বি-ই উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি নয়া দিল্লীস্থ ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'ন। তাঁর কার্য্যকালে সেখানে কৃষি সম্পর্কীয় বহু গবেষণা পরিচালিত হয়। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক হয়ে রুড়কী চলে যান। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাও নিযুক্ত হ'ন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার এবং ন্যাশানাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের উদ্যোগে পার্থে অনুষ্ঠিত প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই সালেই তিনি লিওপোল্ডভিলে (বেলজিয়ান কঙ্গো) অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক সারবিজ্ঞান কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মনোনীত হ'ন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৮৯৩ সালের ২০শে জুন প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি-এস্‌সি পাশ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি কেম্ব্রিজে কিংস্‌ কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। ১৯১৪ সালে গণিতে 'ট্রাইপসের' প্রথম অংশে এবং ১৯১৫ সালে পদার্থবিদ্যায় 'ট্রাইগোসের' দ্বিতীয় অংশে উত্তীর্ণ হ'ন। পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য তিনি উক্ত কলেজের গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে তিনি ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে (উচ্চ) যোগ দেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৮ সালে অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত তিনি এই কলেজেই অধ্যাপনা করেছেন। ১৯২২-৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা, ১৯২২-২৬ পর্য্যন্ত কলিকাতার মিটিয়রোলজিষ্টের কাজও করেন এবং ১৯৪৫-৪৮ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। এই সঙ্গে ১৯১৫-৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে পদার্থবিদ্যার লেকচারার ছিলেন এবং ১৯৪১-৪৫ সাল পর্য্যন্ত পরিসংখ্যান বিভাগের প্রথম সর্ব্বময় কর্ত্তা পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ওয়েল্ডন'

পদক পুরস্কার দেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হ'ন। তিনি বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সভ্য, যথা,—ভারতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, বিলাতের রয়াল পরিসংখ্যান সোসাইটি প্রভৃতি।

১৯৩১ সালে প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন এবং কর্ম্মসচিবের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে 'সংখ্যা' নামক ভারতীয় পরিসংখ্যান পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই তিনি এর সম্পাদনা করে আসছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি আন্তর্জ্জাতিক পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউট এবং বায়োমেট্রিক সোসাইটির সহ-সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ব বিভাগের এবং ১৯৪২ সালে গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৫-৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্ম্মসচিব ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৯৪৬ সালে রয়াল সোসাইটি সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সভ্য হয়ে যুক্তরাজ্যে যান; ১৯৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নিখিল জগৎ পরিসংখ্যান কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৪৯ সালে বার্ণ ও জেনেভায় পরিসংখ্যান ও লোকসংখ্যা কনফারেন্সে

ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ১৯৪৭ সাল থেকে 'ইউ-এন'এর পরিসংখ্যান বিভাগের তিনটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি প্রায় ন'বার বিদেশে যান বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দিতে ও বক্তৃতা করতে।

১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে তিনি তুরস্ক সরকারের অনুরোধে সেখানে যান পরিসংখ্যান উপদেষ্টারূপে। ১৯২৬-২৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপ পরিভ্রমণ করেন।

প্রশান্তচন্দ্র এখন ভারত সরকারের পরিসংখ্যান উপদেষ্টা, দিল্লীতে পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় আয় সমিতির সভাপতি। এ ছাড়া তিনি কলিকাতার ভারতীয় পরিসংখ্যান সমিতির ডিরেক্টর এবং 'ইউ-এন'এর পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতি।

মেঘনাদ সাহা

১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর ঢাকা জেলার অন্তর্গত সেওরাতলী গ্রামে মেঘনাদের জন্ম হয়। পিতা স্বর্গত জগন্নাথ সাহার অবস্থা ভাল ছিল না। মেঘনাদকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে শিক্ষা লাভ করতে হয়। ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকলে মানুষ যে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অতিক্রম করে বড় হতে পারে মেঘনাদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রথমে গ্রামে গুরু মহাশয়ের কাছে, পরে সিমুলিয়া গ্রামে মধ্য-ইংরাজী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ সালে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ৪৲ টাকা করে বৃত্তিলাভ করেন এবং তারই ওপর নির্ভর করে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। স্বদেশী মনোভাবের জন্য প্রথম শ্রেণীতে থাকা কালে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন এবং সেই সঙ্গে বৃত্তি ও ফ্রী-ষ্টুডেণ্টশিপ হারান। ঢাকা জুবিলি স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১১ সালে আই-এস্‌সি পরীক্ষা দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে

পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ ১৯১৩ সালে বি-এস্‌সি পরীক্ষা দেন ও ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হন। ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে এম-এস্‌সি পাশ করেন ও পুনরায় ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হ'ন। এই দুই পরীক্ষায় তাঁর সহপাঠি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এই সময় তিনি ভারতীয় ফিন্যান্স পরীক্ষা দেবার মতলব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুমতি লাভ করতে পারেন নি।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের "আপেক্ষিকতাবাদ" বুঝতে যখন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন সেই সময় এই তরুণ বৈজ্ঞানিক সহজ ভাষায় জনসাধারণের বোঝবার উপযোগী করে এই তথ্যকে প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন সমসাময়িক ছিলেন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

পাশ করার পরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রথমে স্কলার, পরে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন এবং অবসর সময়ে গবেষণা করতে থাকেন। তিনি গণিত বিভাগে ঢুকে পরে পদার্থবিদ্যার বিভাগে চলে যান। ১৯১৯ সালে কয়েকটী মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি পান।* ঐ

---

* বিখ্যাত অধ্যাপক বোর এর দু'বছর আগে হাইড্রোজন পরমাণুর কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানে যুগান্তর আনেন। যুবক

বছরই তিনি "নক্ষত্রের বর্ণালি সম্পর্কে" প্রবন্ধের জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২০ সালে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলাত যান। সেখানে ইম্পিরিয়াল কলেজে অধ্যাপক ফাউলারের গবেষণাগারে কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর জার্ম্মাণীতে অধ্যাপক নার্নষ্টের অধীনে গবেষণা করেন। উভয় স্থানেই উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেন। স্বদেশে ফিরে ১৯২১ সালে তিনি কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিন্তু ভাল পরীক্ষাগারের অভাবের জন্য তাঁর গবেষণার অসুবিধা হতে থাকে। কোন সুবিধা না পেয়ে ১৯২৩ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে আমন্ত্রিত হতেই চলে যান। এইখান থেকে তিনি বহু উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাঁর নূতন

মেঘনাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনিই প্রথম দেখান যে, পরমাণু ও নক্ষত্র একই নিয়মের অধীন। এই সময় তিনি তড়িৎ-চৌম্বকতত্ত্ব ও তরঙ্গ প্রবাহের চাপ ইত্যাদি সম্পর্কীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান গবেষণা হ'ল পরমাণুর থার্মাল আয়োনাইজেশন অর্থাৎ তাপজনিত পরমাণুর তড়িতাবিষ্ট অবস্থা। এতে করে প্রমাণ করলেন যে, পরমাণু, আয়ন ও ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও বায়বীয় গতির এবং তাপজনিত গতিশক্তি, তড়িৎশক্তির নিয়ম খাটে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এই গবেষণাকে অতি উচ্চাঙ্গের বলে মেনে নিলেন।

মতবাদ অত্যন্ত মূল্যবান। * ১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইটালীর কোমো সহরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভল্টার শত বার্ষিকী স্মৃতি উৎসবে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি নরওয়েতে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখতে গিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকদলের সঙ্গে। ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর।

১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে কার্ণেগী ট্রাষ্টের ফেলো হিসাবে তিনি ইংলণ্ড ও য়ুরোপ ভ্রমণ করেন, সেখানকার বিজ্ঞান চর্চ্চার ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে। ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার যে ঢেউ এসেছে, তা মুখ্যতঃ অধ্যাপক সাহার প্রচেষ্টায়। যুক্তপ্রদেশের ন্যাশানাল আকাদেমী অব সায়েন্সেস, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে তিনিই গড়ে তুলেছেন। প্রথমটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং অপর দুইটির

* এই সময় তিনি জটিল বর্ণালির উৎস সম্পর্কে এক নূতন আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশের মাত্র দু'মাস আগে বৈজ্ঞানিক হাণ্ড নিজ আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেন। ফলে মেঘনাদ এই গৌরবে বঞ্চিত হ'ন।

সভাপতি। ১৯৩৮ সাল থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণার জন্য টাটা ট্রাষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুমূল্য এক সাইক্লোট্রন* যন্ত্র উপহার দেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ কণিকা সম্পর্কীয় অনেক উচ্চাঙ্গের গবেষণার কাজ চলছে। ন্যাশানাল প্ল্যানিং, দামোদর ভ্যালী ইত্যাদি বহু ভারতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৫ সালে তিনি রুশিয়ার আকাদেমী অব সায়েন্সের ২২০তম অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় মেঘনাদ ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। ১৯৫২ সালে তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক থেকে অবসর নিয়ে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে ডিরেক্টররূপে যোগদান করেন।

১৯৫৩ সাল থেকে তিনি ভারতীয় বিধান পরিষদের সদস্য-রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁর কার্য্যে ও বক্তৃতায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে রুশিয়া পরিদর্শন করেন।

---

* উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎকণিকা উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত একরকম জটিল যন্ত্র।

মেঘনাদ সাহা

বীরেশচন্দ্র গুহ

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গোয়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলা দেশে প্রথম কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ স্থাপন করেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা হয় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে। এখান থেকে ১৯০৮ সালে তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু অসুখের জন্য তা সম্ভব হয় নি। এক বছর পরে ১৯০৯ সালে তিনি হিন্দু স্কুল থেকে পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হ'ন। ফলিত গণিত শাস্ত্রে এম-এস্‌সি পাশ করেই তিনি বিজ্ঞান কলেজে গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন এবং অধ্যাপনায় ছাত্রদের মুগ্ধ করেন।

এই সময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ" বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল আলোড়ন তোলে। এই মতবাদ মূলতঃ দু'টি সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত :—(১) প্রত্যেক বস্তুর গতি আপেক্ষিক অর্থাৎ নিরপেক্ষ গতি সম্ভব নয়; (২) স্থান ও কাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই মতবাদের

ওপর ভিত্তি করে জ্যোতির্বিদ্যার এবং পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত ও প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর অতি অল্প বৈজ্ঞানিকই এই নূতন তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হ'ন, অথচ বাঙ্গলার দু'জন তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সম্পূর্ণ না হলেও বেশ খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা সরল ইংরেজী ভাষায় এই মতবাদের আলোচনা করে পাঠকদের সুবিধা করে দিয়েছিলেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে, সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানে রীডার হয়ে সেখানে চলে যান। উচ্চাঙ্গের গবেষণা চলতেই থাকে।

এই সময়টা ছিল ইলেক্ট্রনিক্সের যুগ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নিয়েই গবেষণা চলছিল। ইলেক্ট্রন হ'ল পরমাণুর সংগঠক ঋণ-তড়িৎ কণিকা। ইলেক্ট্রনের ধর্ম্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হ'ল ইলেক্ট্রনিক্স। দেখা গেল যে এই গতিবিধি সাধারণ বলবিদ্যার নিয়ম মানে না। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বললেন যে, বলবিদ্যার সাধারণ নিয়ম সাধারণ বস্তুর গতিবিধি দেখে সৃষ্ট হয়েছে। ইলেক্ট্রন অসাধারণ বস্তু, সাধারণের তুলনায় অতীব ক্ষুদ্র। এরা সে নিয়ম মানবে কেন? তখন চেষ্টা চলতে লাগল নূতন নিয়ম আবিষ্কারের আর এ বিষয়ে ভারতে অগ্রণী হ'লেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি আলোক কণিকা সম্বন্ধে দেখালেন যে, সাধারণ পরিসংখ্যান প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাঁর উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান প্রণালী ব্যবহার করলে একটি নিয়ম পাওয়া যায়। বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন এই প্রণালী মেনে নিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পদবী অনুসারে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা এই প্রণালীর নাম দিলেন 'বসু পরিসংখ্যান'। এর পর ইতালির ফার্মি এবং ইংলণ্ডের ডিরাক (উভয়েই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন) আর এক নূতন পরিসংখ্যান প্রণালী আবিষ্কার করেন। এই দু'টি প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাসাদ। তাতেই বুঝতে পারা যায় সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা কত উচ্চ শ্রেণীর।

এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে য়ুরোপে পাঠান বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শনের জন্য। সর্ব্বত্রই তিনি বিশেষ সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। বহু গবেষণাগারে উচ্চ গণিতের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের জটিল সমস্যার সমাধান করে দেন। কিন্তু বিদেশী ডিগ্রী তিনি নিতে রাজী হ'ন নি। বলতেন যে, তাঁর নিজের দেশের ডিগ্রীই যথেষ্ট। এ রকম স্বদেশ প্রীতি খুব কমই দেখা যায়।

স্বদেশে ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পরেই বিজ্ঞান বিভাগের ডীন্ হ'ন। এর ওপর তাঁকে আবার ঢাকা হলের সর্ব্বাধ্যক্ষ করা হয়। সব কাজেই তিনি অতিশয় যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর গবেষণাও চলতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার

অধ্যাপকের পদে গ্রহণ করেন। এখনও তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য মনোনীত হ'ন।

তাঁর মত সাধাসিদা আপন ভোলা লোক খুব কমই দেখা যায়। হাফসার্ট, ধুতি এবং স্যাণ্ডেল তাঁর সাধারণ পোষাক, আর মাথার চুল এলোমেলো। দেখে বোঝবার উপায় নেই যে ইনিই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি একদিন আইনষ্টাইনকেও তাঁর মতবাদে সাহায্য করেছেন।

বিরজাশঙ্কর গুহ

১৮৯৪ সালের ১৫ই আগষ্ট বিরজাশঙ্কর আসাম প্রদেশের গৌহাটি সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অভয়শঙ্কর গুহ। প্রাথমিক শিক্ষা গৌহাটিতে সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন এবং ১৯১৩ সালে এখান থেকে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিদ্যায় এম-এ উপাধি পান। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯২২ সালে সেখানকার এ-এম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। এখান থেকেই তিনি উচ্চ গবেষণার জন্য পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। পঠদ্দশায়ই ১৯২১ সালে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের বিশেষ গবেষক নিযুক্ত হ'ন। ১৯২১-২৩ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যা বিভাগের সহকারীর পদ লাভ করেন।

ভারতে ফিরে তিনি ১৯২৬-২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভৌত-নৃবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় জুলজিক্যাল সার্ভের নৃবিদ্যা বিশেষজ্ঞের পদ লাভ করেন। সেই সময় থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি নৃবিদ্যা বিভাগের কর্ম্মসচিব ও এই বিভাগের পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে তিনি বসু বিজ্ঞান

মন্দিরের অন্যতম ট্রাষ্টি। ১৯৩৯ সালে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৩৯-৪২ সাল পর্য্যন্ত সোসাইটির কর্ম্মসচিব ছিলেন। ভারতীয় ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর তিনি ফাউণ্ডেশন ফেলো। ১৯৩৮-৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি ইনষ্টিটিউটের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি দেশের ও বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সভ্য, যথা: আন্তর্জ্জাতিক নৃবিদ্যা কংগ্রেসের স্থায়ী কাউন্সিল, নৃবিদ্যা পদ্ধতির ষ্টাণ্ডার্ডাই-জেশন কমিটি, প্যারিসের নৃবিদ্যা ইনষ্টিটিউট, যুক্তরাজ্যের রয়াল অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট, বারাণসীর পি-এন-ইউ ক্লাব, ইত্যাদি। ১৯৩৮ সালে তিনি বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃবিদ্যা বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। সেই বছরই তিনি কোপেনহেগনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক নৃবিদ্যা কংগ্রেসের ভৌত-নৃবিদ্যা এবং জাতীয় জীববিদ্যা শাখার সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৪৩ সালে উচ্চ গবেষণার জন্য বাঙ্গালার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে আনাণ্ডেল স্মৃতি পদক প্রদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি জুলজিক্যাল সার্ভের নৃবিদ্যা বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'ন এবং পরে পৃথকভাবে অ্যানথ্রপ-লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি এই নতুন সংস্থার ডিরেক্টর পদ অলঙ্কৃত করেন। এখনও তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর জ্ঞানচন্দ্র পুরুলিয়া সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁদের আদি নিবাস হুগলী জেলার আলমবাটি গ্রামে। পিতা রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অভ্র ব্যবসায়ী ছিলেন সেজন্য তিনি সপরিবারে ছোটনাগপুরে থাকতেন। জ্ঞানচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা গিরিডি স্কুলে হয়। ১৯০৯ সালে তিনি সেখান থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ছোটনাগপুর ডিভিসনে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নজরে পড়ে যান। ১৯১২ সালে তিনি আই-এস্‌সি পাশ করেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। রসায়নে অনার্স নিয়ে বি-এস্‌সি পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সাংসারিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। চারিধারে ঋণ। তাঁর পড়া বন্ধ হবার উপক্রম। সেই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জেমস্‌ জ্ঞানচন্দ্রের আর্থিক অসুবিধার কথা জানতে পেরে অর্দ্ধ বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। জ্ঞানচন্দ্র এই করুণার মর্য্যাদা রক্ষা করেন ১৯১৩ সালে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে

অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে। এ জন্য তিনি ৪০৲ টাকা বৃত্তি ও অনেকগুলি স্বর্ণপদক পান। এই অর্থে তাঁর পড়ার সুবিধা হয় এবং ১৯১৫ সালে রসায়নে এম-এস্‌সি পরীক্ষায় আবার প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর মত বেশী নম্বর রসায়ন-শাস্ত্রে আর কেউ পান নি।

পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তিন বছর ছিলেন এবং লবণাক্ত জল সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় তাঁর এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৯১৮ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং পরের বছরে ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন।

১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে তিনি কিছুদিন গবেষণা করেন। ১৯২১ সালে তিনি বার্লিনে যান। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ব বিখ্যাত অধ্যাপক নার্ণষ্ট জ্ঞানচন্দ্রের লবণাক্ত জলের গবেষণা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়ে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ডাঃ ঘোষের প্রবন্ধ সমূহ জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা এখন সর্ব্ব-বাদিসম্মত। সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত হলেও মূল প্রতিপাদ্য ঠিকই আছে। তাঁর মতবাদ হ'ল যে, লবণাক্ত জলে লবণের

প্রত্যেক পরমাণু জলের সংযোগে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; একটি ভাগ ধন তড়িৎ অপর ভাগ ঋণ তড়িৎ বহন করে।

ভারতে ফিরে ১৯২১ সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে তিনি জড় পদার্থের ওপর আলোক রশ্মির প্রভাব সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি কাশীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি হ'ন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধর মুখার্জ্জী মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেন। পরের বছরে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিখ্যাত জার্ম্মান বিজ্ঞান-পত্রে প্রকাশিত হয় এবং সে জন্য তিনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পান। প্রবন্ধের বিষয় ছিল যে, কি ক'রে বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ শরীরে আলোক সংযোগে শ্বেতসারে পরিণত হয়।

১৯৩১ সালে তিনি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারাল রিসার্চ্চের সভ্য হ'ন। তাঁর তত্ত্বাবধানায় বহু মূল্যবান কৃষি সম্পর্কীয় গবেষণা হয়। কয়েক বছর তিনি ভারতীয় গবেষণা সমিতির এবং ভারতীয় ও বঙ্গীয় শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৮ বছর ঢাকায় অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে তিনি বাঙ্গালোর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে ভারত সরকার তাঁকে উচ্চ গবেষণার জন্য 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর তিনি খড়্গপুর হিজলীতে

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ভাইস চান্সেলার রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্মবিভূষণ (দ্বিতীয় বর্গ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর

শান্তিস্বরূপ ১৮৯৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের সাহ্‌পুর জেলার বেহরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট মাস বয়সে তিনি পিতৃহীন হ'ন। রোজগার করে নিজে শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করেন। লাহোরের ফর্ম্যান খৃশ্চিয়ান কলেজ থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস্‌সি উপাধি লাভ করে ১৯১৯ সালে তিনি বিলাত যান এবং অধ্যাপক ডনানের অধীনে লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে গবেষণা করেন। 'ইমালশান' সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য ১৯২১ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি পান। তারপর কিছুদিন প্যারিসে সর্ব্বোনে এবং বের্লিনে কাইজার উলহেল্ম ইনষ্টিটিউটে কাজ করেন। স্বদেশে ফিরে তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯২৪ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি লাহোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত-রসায়নের অধ্যাপক এবং রসায়নাগারের ডিরেক্টর রূপে যোগ দেন। এইখানে তিনি একটানা ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে কোলয়েড, * সার্ফেস ও ফটো রসায়ন বিশেষ উল্লেখ-

* যদি দ্রাব্য ও দ্রাবক অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে না যায় অথচ ছেঁকে তাদের পৃথক করা যায় না, এই অবস্থায় দ্রাব্য পদার্থকে কোলয়েড বলে।

যোগ্য। ১৯২৬ সালে তিনি চৌম্বক রসায়ন সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ও শ্রী কে, এন, মাথুর উভয়ে মিলে চৌম্বক-রোধ বাধা মাপবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্র অ্যাডাম এণ্ড হিলজার্স কর্তৃক বাজারে চালু হয়। ১৯৩৫ সালে মাথুরের সহযোগে চৌম্বক-রসায়ন সম্পর্কে এক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজী ভাষায় এই বিষয়ে এইটীই প্রথম পুস্তক।

অধ্যাপক ভাটনাগরের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বিজ্ঞান যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয় তবে মানবের উন্নতি হতে পারে না। তিনি মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি লিমিটেডকে তেলের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন। ফলে তাঁরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষণাগার খুলে দেন। এইখান থেকে তিনি যে সকল গবেষণা করেন তার মধ্যে কাদা (মাড্) সমস্যা, গন্ধহীন মোম, রিফাইন করা কেরোসিন তেল, ধাতুর ক্ষয় নিবারক ইত্যাদি বিশেষ মূল্যবান। এ সবের জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও রয়ালটি পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই নিতে রাজী হন নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার তাঁকে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন। খাটুনির কাজ, হিসেব নিকেশ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন অক্লান্তভাবে। গ্যাস নিরোধ-কারী কাপড় ও ভার্ণিশ, হাওয়ার ফেণার সলিউশন, উদ্ভিজ্জ

তৈল, এমন পাত্র যা ফাটবে না, জলবিহীন রেড়ির তৈল, আবর্জ্জনা থেকে প্ল্যাষ্টিক, কৃত্রিম কাঁচ ইত্যাদি কত যে মূল্যবান গবেষণা তার ইয়ত্তা নেই।

প্রথমে তাঁর এই চাকরীটা ছিল যুদ্ধকালীন, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এই গবেষণাগারে যে কাজ হচ্ছে তাতে জাতীয় উপকার সাধিত হবে। সুতরাং এটাকে স্থায়ী করে দেওয়া হ'ল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সহায়তায় এবং অধ্যাপক ভাটনাগরের প্রচেষ্টায় ভারত ব্যাপী গবেষণাগার সমূহ প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল। সার সি, ভি, রমন এই প্রচেষ্টার নাম দিয়েছিলেন "নেহরু ভাটনাগর এফেক্ট।" প্রথমযোগে ১২টি জাতীয় গবেষণাগার * পুরোপুরি খোলা হয়ে গেছে। আরও খোলবার কথা আছে। তাঁরই উদ্যোগে ভারত সরকারের একটি বিভাগ খোলা হয়েছে—প্রাকৃতিক অবদান

---

* (১) ন্যাশানাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী, পুনা; (২) ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, নতুন দিল্লী; (৩) ফুয়েল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, জেয়ালগোরা; (৪) সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা; (৫) সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, মহীশুর; (৬) ন্যাশানাল মেটালার্জ্জিক্যাল ল্যাবরেটরী, জামশেদপুর [এই সকল ১৯৫০ সালে]; (৭) সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, লক্ষ্ণৌ [১৯৫১]; (৮) সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, দিল্লী [১৯৫২]; (৯) সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, করাইকুড়ি; (১০) সেণ্ট্রাল লেদার রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, মাদ্রাজ; (১১) সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, রুড়কী [এই সকল ১৯৫৩ সালে]; (১২) সেণ্ট্রাল সল্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, ভবনগর [১৯৫৪]।

ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর। তিনিই হলেন এই দপ্তরের কর্ম্ম-সচিব। তাঁর প্রচেষ্টায় "ভারতীয় দুর্লভ খনিজ লিমিটেড" নামক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে যার কাজ পরমাণবিক ও গন্ধক ঘটিত খনিজের সন্ধান। তাঁরই উদ্যমে ভারতে তৈল নিষ্কাশক ও পরিষ্কারক যন্ত্রাদি স্থাপিত হয়েছে।

ডাঃ ভাটনাগর তাঁর গবেষণা ও কার্য্যকলাপের জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। ১৯৩৬ সালে সরকার থেকে তিনি 'ও-বি-ঈ' এবং ১৯৪১ সালে 'স্যর' উপাধি পান। ১৯৪৩ সালে রাসায়নিক শিল্প সোসাইটি তাঁকে সভ্য করে নেন, পরে সহ-সভাপতির পদে বরণ করেন। ঐ বছরই বিলাতের রয়েল সোসাই-টির সভ্য মনোনীত হ'ন। অক্সফোর্ড, পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য সংস্থারও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দুর্গাপ্রসাদ খৈতান পদক লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি এশিয়াটীক সোসাইটীর সভ্য মনোনীত হন।

১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্মবিভূষণ (দ্বিতীয় বর্গ) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন।

সুন্দরলাল হোরা

সুন্দরলাল ১৮৯৬ সালের ২রা মে জালান্দার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্যেন দাস অ্যাংলো-সংস্কৃত হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি লাহোরে গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯১৯ সালে প্রাণিবিদ্যায় এম-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্স ও ম্যাকল্যাগান স্বুবর্ণ পদক লাভ করেন।

কলেজে স্বর্গত কর্ণেল জন ষ্টীফেন্সনকে সুন্দরলাল অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক রূপে পেয়েছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় সুন্দরলাল গবেষণা আরম্ভ করেন এবং "লাহোরের মৎস্য" নামক প্রবন্ধ লিখে ১৯২২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস্‌সি উপাধি পান। ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় সজাগ ছিলেন। তাঁর বন্ধু ডক্টর নেলসন আনাণ্ডেল যখন লাহোরে যান সেই সময় সুন্দরলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ফল আশানুরূপ হয়। আনাণ্ডেল কলিকাতায় ফিরে সুন্দরলালকে জুলজিক্যাল্ সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে গবেষণার জন্য যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানান। বিনা মাহিনায়, সামান্য হাত খরচায়। সুন্দরলাল তাতেই রাজী হয়ে যান। বছর দু'য়েক পরে তিনি ভারত সরকারের পরীক্ষামূলক দুইটি গবেষণা বৃত্তির একটি লাভ

–করেন। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিলাত না গিয়ে গবেষণা সম্ভব কিনা দেখা। হোরা উচ্চাঙ্গের গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন যে এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয় নি। ১৯২১ সালে তিনি সার্ভে দপ্তরের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হ'ন। তিনি বিলাত যাবার জন্য চার শ' পাউণ্ডের সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করে উক্ত পদে যোগ দেন।

এইখানে সকল কাজে তিনি আনাণ্ডেলের সাহায্য পেতেন। মৎস্য সম্পর্কীয় গবেষণায় তিনি মনোনিবেশ করেন। শুধু গবেষণাগারে বসে নয়, দেশে দেশে ঘুরে মাছ জোগাড় ক'রে। ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে মণিপুরে যান লোকটাক হ্রদের মাছ সম্পর্কে গবেষণার জন্য। ১৯২১ সালে প্রকাশ করেন "মণিপুরের মৎস্য" নামক এক মূল্যবান প্রবন্ধ। গত যুদ্ধের সময় চতুর্দ্দশ সৈন্যবাহিনী মণিপুরে থাকা কালে এই প্রবন্ধ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিল। ১৯২২ সালে তিনি ক্রম-বিবর্ত্তনশীল জীববিদ্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২৮ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে "দ্রুতগামী জলের প্রাণিকুল" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৯৩০ সালে সেই বক্তৃতা বিশদাকারে ওখানকার ফিলজফিক্যাল ট্রানজ্যাকশনে প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালে প্রকাশ পায় তাঁর "হোমাল্পটেরিড মৎস্যকুলের বিবর্ত্তনবাদ" নামক প্রবন্ধ। ১৯৩৫ সালে তিনি এক নূতন ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—"মৎস্যকুলের রূপ ও গতির পারম্পর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু মতবাদ।" ১৯৩৭ সালে

সুন্দরলাল হোরা

ভালচন্দ্র বি, মুন্দকার

মহারাজাপুরম সীতারাম কৃষ্ণন

কারিয়ামাণিকাম্ শ্রীনিবাস কৃষ্ণন

তিনি অনেকগুলি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, যথা,—প্রাণিকুলের তুলনামূলক পরিচয়, মৎস্যের জীবাশ্ম, মৎস্য-বিতরণ সমস্যা অর্থাৎ কোথায় কোন জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

এই সকল গবেষণা থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয় ১৯৪২ সালে, যখন তিনি বঙ্গের মৎস্যবিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই বিভাগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তার পর তিনি পুনরায় ভারতীয় জুলজিক্যাল সার্ভেতে ফিরে যান, ডিরেক্টর হয়ে। ১৯৩৯ সালে তিনি যে "সাতপুরা প্রকল্প" সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন এইবার তা পূর্ণরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। বৈজ্ঞানিক মহলে এটা এখন সর্ব্বজন-স্বীকৃত মতবাদ।

ডক্টর হোরা এডিনবরা রয়েল সোসাইটির এবং লিনাইন সোসাইটির ফেলো; জুলজিক্যাল সোসাইটি এবং ইনষ্টিটিউট অব বায়োলজির সভ্য। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ও জয়গোবিন্দ লাহা স্বর্ণপদকধারী, ভারতীয় ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের এবং জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো; ভারতীয় জুলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো ও সার দোরাবজী টাটা মেমোরিয়াল পদকপ্রাপ্ত।

১৯৪৬ সালে তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক কনফারেন্স ও রয়াল সোসাইটির এম্পায়ার সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বাগুইওতে

(ফিলিপাইন) এফ-এ-ও ফিশারীজ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হয়ে এশিয়ার মৎস্যকুল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সালে 'ইউ এন 'ও' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে লেক সাকসেসে যান এবং "অপেক্ষাকৃত গরম জলের মৎস্যকুল" সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ফলে তাঁকে গ্রীষ্ম প্রধান (ট্রপিক্যাল) দেশের মৎস্য সম্পর্কে ইউ এন-এর উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫১ সালে ইণ্ডো-পাসিফিক ফিশারীজ কৌন্সিলের যে অধিবেশন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত কৌন্সিলের ইলিশ মৎস্য সাব-কমিটির তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালের শেষভাগে তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রিত হয়ে যান সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে। ১৯৫৩ সালে বিলাত যান বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে। ১৯৫৪ সালের আগষ্টমাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার এবং ন্যাশানাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের উদ্যোগে পার্থে অনুষ্ঠিত প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন সায়েন্স অ্যাসেসিয়েশনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি-দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ভালচন্দ্র বি, মুন্দকার

১৮৯৬ সালের ২৬শে জুন ভালচন্দ্র বাঙ্গালোরে জন্মগ্রহণ করেন। এইখানে তাঁর স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯১৬ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। এখান থেকেই তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ১৯২১ সালে বি-এ পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন।

ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ধারওয়ারে কার্পাস তূলার (ছত্রাক বিষয়ক) পরীক্ষাগারে সিনিয়র সহকারী পদে নিযুক্ত হ'ন। ১৯২৮ সালে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রুফাস জে, ল্যাকল্যাণ্ড ফেলোশিপ লাভ করেন এবং আইওয়া স্টেটের কৃষি কলেজে যোগ দেন, গাছগাছড়ার ছত্রাক ও বীজাণু ঘটিত রোগ সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে। পরে তিনি গবেষণা এবং অধ্যাপনার জন্য মনোনীত হ'ন। ১৯৩০ সালে এখান থেকেই তিনি পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন ওখানকার কর্ম্মপদ্ধতি ভাল করে শেখবার জন্য।

১৯৩০ সালে ভারতে ফিরে তিনি সেই পুরাণো পরীক্ষাগারে যোগ দেন, সহকারীরূপে নয় পরীক্ষক হয়ে। ১৯৩১ সালে তিনি বিহার প্রদেশের পুসায় (এখন নূতন দিল্লীতে) অবস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষক (মাইকোলজিষ্ট) নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারত সরকারের কৃষি

দপ্তরের প্ল্যাণ্ট প্রোটেকশন অ্যাণ্ড কোয়ারাণ্টাইন (বনজ রক্ষা) বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মনোনীত হ'ন।

কৃষি গবেষণাগারে তিনি চাউল, তামাক এবং অন্যান্য শস্যাদির এক বিশেষ রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯১৪ সালে, গমের রোগ চলাচল পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করেন। গম, বার্লি, জোয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন শস্যের রোগ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করেছেন। ১৯:৮ সালে তিনি "ভারতের ছত্রাক" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

১৯৩৯ সালে ভারত সরকার প্রেরিত কৃষি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্যরূপে আফগানিস্থান যান এবং "আফগানিস্থানের ছত্রাক" নামক এক পুস্তক লেখেন। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কমনওয়েলথ মাইকোলজিক্যাল কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন এবং ধারাবাহিক সিষ্টেমেটিক মাইকোলজি বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৯ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ফাইটো-স্যানিটারী কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে রবারের চাষের সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান পরামর্শ দেন। তাঁর এবং জে. এফ. দস্তুরের উদ্যোগে ভারতে ফাইটো-প্যাথলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। মুন্দকারই প্রথম কর্ম্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৫০ সালে তিনি এই সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি এই সোসাইটির

পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯১০ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের নামকরণ নমেন্‌ক্লেচার কমিটির তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত ছত্রাক ও গণের সংমিশ্রণ "মুন্দকারেলা" নামে বৈজ্ঞানিক জগতে পরিচিত।

তিনি আমেরিকার ফাইটো-প্যাথলজিক্যাল এবং মাইকোলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য। ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো।

১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

মহারাজাপুরম্ সীতারাম কৃষ্ণন

১৮৯৮ সালের ২৪শে আগষ্ট মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলার মহারাজাপুরম্ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে সীতারাম জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায় চিরকালই তিনি খুব ভাল ছিলেন। ১৯১৯ সালে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি প্রশংসার সঙ্গে ভূবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পাশ করেন এবং প্রায় দু' বছর ঐ কলেজেই ডেমনষ্ট্রেটরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বৃত্তি পেয়ে বিলাতে যান এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিতে (অধুনা রয়াল কলেজ অব সায়েন্স) ভর্ত্তি হ'ন। এখান থেকেই তিনি ১৯২২ সালে এ-আর-সি-এস্ এবং ১৯২৩ সালে ডি-আই-সি উপাধি লাভ করেন। পরবর্ত্তী বছরে 'কাথিয়াওয়াড়ের প্রস্তর' সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি পান। এই কলেজ থেকেই তিনি ভূবিদ্যায় খনিতত্ত্ব সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২৪ সালে ডাঃ কৃষ্ণন ভারতীয় ভূবিদ্যা বিষয়ক সংস্থার (জিওলজিক্যাল সার্ভে) সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯২৭-২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ডেরাডুনের ফরেষ্ট কলেজের লেকচারার ছিলেন। ১৯৩৩-৩৫ সালে তিনি কলিকাতার

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভূবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এবং সেই সঙ্গে জিওলজিক্যাল সার্ভে ও মিউজিয়ামের কিউরেটরের কার্য্যভারও গ্রহণ করেন।

১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা পরিভ্রমণ করেন খনিতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। ১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে এলে ভারত সরকার তাঁকে কয়লা খনি কমিটির সভ্য নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি কয়লা খনিগুলিকে জাতীয়করণ সম্পর্কে যে পরামর্শ দেন, তখন সকলেই তা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু ১৯৪৭ সালে তাঁর পরামর্শ-ই গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ন।

১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভের সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন এবং ১৯৪৫ সাল থেকে সুপারিণ্টেণ্ডিং জিও-লজিষ্ট (ভূতত্ত্ববিদ্) নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৮ সালে তিনি নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া ব্যুরো অব মাইন্সের ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই গৌরবময় পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়।

১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত রয়াল সোসাইটি এম্পায়ার সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে তিনি ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠান, সেখানকার ভূতত্ত্ব ও খনিতত্ত্ব সম্পর্কে কর্ম্মপদ্ধতি দেখে আসতে। 'ধাতু নিষ্কাশনের

ব্যবহারোপযোগী কয়লা’ সম্পর্কে ভারত সরকার যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন তিনি তার সভাপতি ছিলেন। এই সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে আগষ্ট মাসে লেক সাকসেসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সে তিনি ছিলেন ভারতের একজন প্রতিনিধি।

১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূবিদ্যা-শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সভ্য মনোনীত হ’ন। ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি ভারতীয় ভূবিদ্যা, খনিতত্ত্ব ও মেটালার্জ্জিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ইণ্ডিয়ান আকাদেমী অব সায়েন্স, ন্যাশানাল আকাদেমী অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স ইত্যাদির তিনি সভ্য। এছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের ভূবিদ্যা, খনিতত্ত্ব ও মেটালার্জ্জি সম্পর্কীয় প্রায় সকল সোসাইটির তিনি সভ্য। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুর সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

কারিয়ামাণিক্যম্ শ্রীনিবাস কৃষ্ণন

শ্রীনিবাস কৃষ্ণন ১৮৯৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর দক্ষিণ ভারতের ওয়াটরাপ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সেখানকার হিন্দু হাই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে শ্রীভিল্লিপুত্তুরে কলেজী শিক্ষা পান মাত্বরার আমেরিকান কলেজে, মাদ্রাজের খৃশ্চান কলেজে এবং এম-এস্‌সি পাশ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি মাদ্রাজ খৃশ্চান কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার ও গবেষণার আগ্রহ তাঁকে সেখানে বেশী দিন থাকতে দেয় নি। ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতায় এসে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স নামক বিখ্যাত গবেষণাগারে যোগ দেন ও জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের অধীনে কাজ শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হয়ে যোগ দেন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। ১৯৩৩ সালে যখন অধ্যাপক রমন কলিকাতা ত্যাগ করেন তখন তিনি উক্ত অ্যাসোসিয়েশনে নবপ্রবর্ত্তিত পদার্থ-বিদ্যার মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দ্দেশে উচ্চাঙ্গের গবেষণার ধারা অব্যাহত ভাবেই চলছে

থাকে, যেমন চলছিল অধ্যাপক রমনের সময়ে। আলোকবিদ্যায়, বিশেষ করে কৃষ্ট্যালের চুম্বক শক্তির অপূর্ব্ব গবেষণার জন্য ১৯৪০ সালে তাঁকে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯৪২ সালে তাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় এবং তিনি সে পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর তিনি নূতন দিল্লীতে ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর প্রথম ডিরেক্টর হয়ে চলে যান।

অধ্যাপক কৃষ্ণন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের গবেষণা ছিল বহুমুখী। ১৯২৩-২৮ সালের মধ্যে তিনি কাজ করেন আলোকের বিচ্ছুরণ ও আণবিক আলোক তত্ত্ব নিয়ে। এই সময় তিনি অধ্যাপক রমনের সঙ্গে "রমন এফেক্ট" সম্পর্কেও গবেষণা চালান। ঢাকায় থাকতে এবং কলিকাতা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে ফিরে আসার পর তিনি কৃষ্ট্যালের চৌম্বক শক্তি সম্পর্কে যে গবেষণা করেন তাতেই তিনি জগতের বৈজ্ঞানিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হ'ন। এই গবেষণার কথা ও তথ্য সমূহ প্রকাশিত হয় লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির পত্রিকায়। কৃষ্ট্যালের ওপর আলোক এবং এক্সরে'র প্রভাব নিয়েও তিনি অতি উচ্চাঙ্গের পরীক্ষা চালান। এলাহাবাদে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ধাতুর এবং সংকর ধাতুর তাপ ও বৈদ্যুতিক ধর্ম্ম।

১৯৩৩ সালে তিনি প্রথম য়ুরোপ যান, ওয়ারস'তে আন্তর্জ্জাতিক ফটোপ্রভা কনফারেন্স কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে।

১৯৩৭ সালে তিনি সমগ্র য়ুরোপ ভ্রমণ করেন। লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউশন, কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী ইত্যাদি বহু প্রসিদ্ধ গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আহূত হ'ন বক্তৃতা দেবার জন্য। লীজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক দিয়ে। ১৯৩৯ সালে তিনি পুনরায় য়ুরোপ যান। এবারে নিমন্ত্রণ হয়েছিল ইনষ্টিটিউট অব ষ্ট্রাসবুর্গের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক চৌম্বক শক্তি সম্পর্কীয় কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য। ১৯৪৬ সালে তিনি আবার বিলাত গেলেন রয়াল সোসাইটি কমনওয়েলথের বিজ্ঞান কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। সেখানে তিনি পদার্থ-বিদ্যা ইনষ্টিটিউটে এক্সরে সম্পর্কীয় কয়েকটি উচ্চাঙ্গের পরীক্ষা দেখান। ভারত সরকারের অনুরোধে তিনি য়ুরোপের ও আমেরিকার কয়েকটি বিখ্যাত বিজ্ঞানাগার পরিদর্শন করেন, আধুনিক গবেষণা প্রণালী লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে। ১৯৪৮ সালে তিনি পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে যান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদলের সঙ্গে। এই সময় তিনি ফ্রান্স, সুইডেন, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং বিলাতের আণবিক শক্তির আধুনিক গবেষণাগার সমূহ দেখেন এবং কর্ম্মধারা লক্ষ্য করেন। প্যারিসে থাকা কালে তিনি ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের বার্ষিক কনফারেন্সে যোগদান করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত আণবিক শক্তি কমিশন ও গবেষণাগারের সভ্য হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি 'স্যর'

উপাধিতে ভূষিত হ'ন এবং ১৯৪৮ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান-সূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি প্রদান করেন।

অধ্যাপক কৃষ্ণন ভারত এবং বিদেশের বহু বিজ্ঞান সমিতির সভ্য। তিনি ভারতের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো এবং ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট।

তিনি এখন ভারত সরকারের নূতন দিল্লীতে অবস্থিত ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্ম বিভূষণ (দ্বিতীয় বর্গ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

এস্ রামচন্দ্র রাও

১৮৯৯ সালের ১৫ই মে রামচন্দ্র রাও দক্ষিণ ভারতের মান্নারগুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় ঐখানকারই ফিণ্ডলে কলেজে। ১৯২০ সালে ত্রিচিনোপল্লীর সেণ্ট জোসেফ কলেজ থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় বি-এস্‌সি (অনার্স) ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন, প্রথমে মাদুরার আমেরিকান কলেজে এবং পরে চিদম্বরমের শ্রীমীনাক্ষী কলেজে।

১৯২৬ এবং ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশনের গবেষণাগারে এসে স্যর সি, ভি, রমনের অধীনে আলোক-বিক্ষেপণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান ও লণ্ডনের কিংস্ কলেজে অধ্যাপক রিচার্ডসনের অধীনে "এক্সরে এবং ইলেক্ট্রন বিকীরণ" সম্পর্কে গবেষণা করে ১৯৩০ সালে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। এইখান থেকেই ১৯৩৭ সালে তিনি ডি-এস্‌সি উপাধি পান।

ভারতে ফিরে তিনি আন্নামালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন এবং চৌম্বক তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ

করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে বাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল কলেজে যোগ দেন। এখান থেকে তিনি প্রায় দেড়শ' মৌলিক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

তিনি লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সের, ভারতীয় সায়েন্স আকাদেমীর এবং ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্-এর ফেলো। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বোর্ড অব ষ্টাডীজের মেম্বার।

১৯৫২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

এল, এ, রামদাস

১৯০০ সালের ৩রা জুন ডাঃ রামদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গত দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের তৃতীয় পুত্র। ডাঃ আয়ার ভারতের বিখ্যাত নৃবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ১৯২০-৩০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যা বিভাগের পরিচালনা করেছেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাজে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছেন। রামদাসের প্রাথমিক শিক্ষা হয় কোচিন ষ্টেটের ত্রিচূরে এবং আর্নাকুলমে। পরে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২০ সালে পদার্থবিদ্যায় বি-এ উপাধি লাভ করেন। সেই সময় অধ্যাপক রমনের নাম ও যশ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের কর্ম্মসচিব। তাঁর কাছে পড়বার এবং কাজ করবার আগ্রহে রামদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পদার্থ-বিদ্যায় এম-এ পাশ করবার পর তিনি অধ্যাপক রমনের অধীনে পালিত রিসার্চ্চ স্কলাররূপে গবেষণা করবার সুযোগ পান। আলোক বিক্ষেপণ সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত 'রমন এফেক্ট'-এর গবেষণা তখন চলছে। অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারে কার্য্য-কালে তিনি প্রমাণ করেন যে, তরলের উপরিতলে আপতিত

আলোকের ছড়িয়ে পড়ার (বিচ্ছুরণ) কারণ তলদেশের অণুসমূহের ভাঙ্গন। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯২৬ সালে তিনি এই আবিষ্কারের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ রামদাস ইণ্ডিয়ান মিটিওরোলজিক্যাল সার্ভিসে (হাওয়া আপিস) যোগ দেন। করাচীতে থাকাকালে তিনি উড়োজাহাজকে হাওয়া আপিস কি ভাবে সাহায্য করতে পারে—এই সম্পর্কে অনেক তথ্য নির্দ্দেশ করেন। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে পুনায় নব স্থাপিত কৃষি-হাওয়া আপিসের (এগ্রিকালচারাল মিটিওরোলজি) ভার গ্রহণ করেন। এই বিভাগটি ভারতীয় কৃষি গবেষণা কৌন্সিলের তরফ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হয়। ডাঃ রামদাসের নেতৃত্বে যে সকল উচ্চাঙ্গের গবেষণা হয় তা দেখে কৌন্সিল এই বিভাগকে স্থায়ী করে দেন। ডাঃ রামদাস হ'লেন এই বিভাগের ডিরেক্টর। তাঁর গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালে সরকার তাঁকে 'এম-বি-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডাঃ রামদাস বাঙ্গালোরের ভারতীয় সায়েন্স আকাদেমী, এলাহাবাদের ন্যাশানাল সায়েন্স আকাদেমী এবং ভারতীয় ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। এছাড়া তিনি লণ্ডনের রয়াল মিটিওরোলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং আমেরিকান মিটিওরোলজিক্যাল সোসাইটির প্রফেশনাল সভ্য।

১৯৪৮ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার এবং ন্যাশনাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের উদ্যোগে পার্থে অনুষ্ঠিত প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বীরেশচন্দ্র গুহ

১৯০৩ সালের ১৬ই জুন বীরেশচন্দ্র ময়মনসিং সহরে এক সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রাম। পিতা স্বর্গত রাসবিহারী গুহঠাকুরতা। বীরেশচন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। মাতুল স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত (বরিশাল)। প্রাথমিক শিক্ষা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে। সেখানকার কলেজ থেকেই আই-এস্‌সি পরীক্ষা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে একমাস জেল হওয়াতে অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেব তাঁকে ট্রান্সফার নিতে বাধ্য করেন। পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বি-এস্‌সি পরীক্ষা দেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ থেকে ফলিত রসায়নে এম-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে বি-এস্‌সি ও এম-এস্‌সি উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এস্‌সি পঠদ্দশায় তিনি স্বর্গত স্যর পি, সি, রায়ের অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবার জন্য টাটা স্কলারশিপ পান। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট পাসপোর্ট দিতে নারাজ হ'ন। এক

বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার জষ্টিস স্যর এডয়ার্ট গ্রীভ্‌স, স্যর পি, সি, রায় এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের চেষ্টায় পাসপোর্ট পান। ১৯২৬ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপক (এখন স্যর) জ্যাক ড্রামণ্ডের পরীক্ষাগারে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যর গৌল্যাণ্ড হপকিন্সের পরীক্ষাগারে তিনি জৈব-রসায়নশাস্ত্র, বিশেষ করে খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এইচ্‌-ডি এবং পরে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন।

দেশে ফিরে তিনি কিছুদিন বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রধান রসায়নবিদের কাজ করেন। পরে বিদ্যাসাগর কলেজে রসায়নের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের স্যর রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৩৮ সালে তিনি ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোসিপ লাভ করে য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন, ওখানকার শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে। ঐ সালে কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর অধিবেশনে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। ঐ বছরেই তিনি জুরিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শারীরবৃত্ত কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ গুহকে সরকারের খাদ্যবিভাগে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টারূপে অস্থায়ীভাবে যোগ দেবার অনুমতি দেন। ভারতের খাদ্য-শিল্পের অধুনা যে উন্নতি হয়েছে তা বলতে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টায়। ফুড-টেকনোলজি সম্পর্কে অন্যান্য দেশের আধুনিক উন্নতি পরিদর্শনের জন্য তিনি যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। দু'বছর পরে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন গঠিত হওয়ায়, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুপারিশে, বীরেশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য (পশ্চিমবঙ্গ থেকে) নিযুক্ত হন। এখানে তিনি পাঁচ বছর কাজ করেন। এই সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান, পেনসিলভিনিয়ার টেনেসী ভ্যালী দেখতে। ফিরে এসে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। এখন তিনি টেকনোলজী বিভাগের ডীন এবং ফলিত রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। ১৯৪৫ সালে ভারতের যে প্রতিনিধিদল বৈজ্ঞানিক সফরে রাশিয়া যান, বীরেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

জৈব-রসায়ন সম্পর্কীয় গবেষক হিসাবে ডাঃ গুহ দেশ বিদেশে খ্যাত। খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁকে একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশুদ্ধ এবং ফলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মিলনেই মানব জাতির

প্রকৃত উন্নতি হবে এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মানুষের অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের প্রথম কাজ মানুষকে সুস্থ সবল করা। এই দিকেই তিনি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন।

১৯৪৬ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়নশাস্ত্র শাখার সভাপতিত্ব করেন।

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

১৯০৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায় ডাঃ কুণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম-এস্‌সি পাশ করেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন তিনি কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজে উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতার সায়েন্স কলেজে রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ্চ স্কলাররূপে যোগ দেন এবং দু'বছরেরও অধিক এখানে গবেষণা করেন। ১৯৩০ সালে রাজসাহীর গভর্ণমেণ্ট কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৩৭ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রিষ্টলি'র অধীনে গবেষণা করে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পাট এবং শণের তন্তুর গঠন এবং বৃদ্ধি। লীডসে থাকাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগেও যোগ দেন (ক্যাজুয়াল ছাত্ররূপে) এবং অধ্যাপক কোম্বারের কাছে সার-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন।

১৯৩৯ সালে ভারতে ফিরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। সেই সঙ্গে তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে উদ্ভিদবিদ্যার অবৈতনিক লেকচারাররূপে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালের শেষ-ভাগে তিনি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীর (পাট কৃষি গবেষণাগার) ডিরেক্টর নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় নূতন পদে যোগদান করেন। ভারত বিভাগের পর পরীক্ষাগার ঢাকা থেকে সরিয়ে ভারতে আনা হয়—প্রথমে হুগলীতে, পরে (এখন) ব্যারাকপুরে। এর নূতন নাম-করণ হ'ল জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট এবং ডাঃ কুণ্ডু হলেন তার প্রথম ডিরেক্টর। তাঁর নেতৃত্বে এখানে পূর্ণ উদ্যমে গবেষণার কাজ চলছে।

দেশবিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সকল প্রামাণিক গ্রন্থে তাঁর একাধিক গবেষণা স্থান লাভ করেছে। তাঁরই উদ্যোগে ভারত সরকারের অল ইণ্ডিয়া জুট ডেভালপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয়েছে। রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টরের কাজের সঙ্গে তাঁকে এই বিভাগেরও সকল কার্য্যভার নিতে হয়েছে। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় পূর্ব্ব-পাকিস্থান বাঙ্গালা থেকে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতে পাটশিল্প উন্নতি লাভ করতে পেরেছে।

ডাঃ কুণ্ডু ভারতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস এবং লণ্ডনের লিনাইন সোসাইটির ফেলো। বহুদিন তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাউন্সিল এবং পরিচালক সমিতির

সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বোটানিক্যাল সোসাইটির কর্ম্ম-সচিব ও ভারতীয় বোটানিক্যাল সোসাইটির পরিচালক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বহু বছর ধরে তিনি ভারত সরকারের ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের টেক্সটাইল বিভাগীয় কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯৫৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

ভোজরাজ শেঠ

এস, রামচন্দ্র রাও

এল, এ, রামদাস

ভোজরাজ শেঠ

১৯০৭ সালের ২৭শে আগষ্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের (অধুনা পশ্চিম পাকিস্থান) ভেরা গ্রামে ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কলেজী শিক্ষা দিল্লীর হিন্দু কলেজে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং বহু বৃত্তি ও পদক পেয়েছেন। ১৯২৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত-শাস্ত্রে এম-এ পাশ করার পর তিনি ভারত সরকার থেকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য সেণ্ট্রাল স্টেট স্কলারশিপ পান। তিনি বিলাতে গিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সেখানকার এম-এস্‌সি ও পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। উচ্চ গবেষণার জন্য মাত্র ২৯ বছর বয়সে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৩৭ সালে ইতালীর পেরুজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি হিন্দু কলেজে গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-শাস্ত্রের রীডার নিযুক্ত হ'ন। ১৯৩৯ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে কয়েকটি উচ্চ গণিত সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল "দ্বিমাত্রিক সীমাস্থমান সমস্যা"। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের সপ্তম আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে ভারত সরকার তাঁকে প্রতিনিধি করে পাঠান। ১৯৪৯ সাল থেকে দু' বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া ষ্টেট কলেজে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। তাঁর নির্দ্দেশে গবেষণা করে ছ'জন ছাত্র এম-এস্‌সি ও পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি আমেরিকান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে মিশিগানে যান, ফলিত গণিত সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে। তাঁর এই সময়ের বক্তৃতাসমূহ নিউইয়র্কের ম্যাকগ্র হিল নামক পুস্তক প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা ম্যাথোমেটিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে যুক্তরাষ্ট্রে যান, বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক গণিতজ্ঞ কনফারেন্সে যোগ দিতে। ১৯৫৪ সালে আমষ্টারডামে অনুষ্ঠিত উক্ত কনফারেন্সের অধিবেশনে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং সেখানে "সংনমনশীল প্রবাহের সাংশ্লেষিক পদ্ধতি" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে "সসীম বিকৃতি" সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন।

ভোজরাজ উচ্চ গাণিতিক গবেষণার জন্য আন্তর্জ্জাতিক যশ অর্জ্জন করেছেন। দেশ বিদেশের বহু পত্রিকায় তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী,

জাপান সর্ব্বদেশে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত ও আদৃত হয়েছে। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কীয় সকল আধুনিক পুস্তকে তাঁর গবেষণা স্থান লাভ করেছে।

ডাঃ শেঠ ভারতের, য়ুরোপের, যুক্তরাজ্যের এবং যুক্তরাষ্ট্রের বহু বৈজ্ঞানিক সোসাইটি ও আকাদেমীর সভ্য। তিনি এখন ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিতবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

বি, আর, শেষাচার

১৯০৮ সালের ৯ই জানুয়ারী ডাঃ শেষাচার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকালই ভাল ছাত্র ছিলেন। ১৯২৬ সালে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় এম-এস্‌সি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সুবর্ণ পদক ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪০ সালে মৌলিক গবেষণার জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "আপোদা-আম্ফিবিয়ার সাইটোলজী" অর্থাৎ উভচরজাতীয় জীবকোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম (প্রোটীন জাতীয় অতি জটিল গঠনের এক রকম কোলয়ড্যাল পদার্থ, অনেকটা জেলির মত) সম্পর্কে বিচার।

১৯২৬ সাল থেকে তিনি বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজে অধ্যাপনা করছেন। এখন তিনি সেখানকার প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগের কর্তা। সাইটোলজি ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণা আছে, তন্মধ্যে সাইটো-কেমিষ্ট্রী প্রধান। তিনি জীবজগতের ক্ষুদ্রতম এককোষী জীবাণুর কেন্দ্রীন-অম্ল সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান, ফিলাডেলফিয়ার পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারিসন রিসার্চ্চ ফেলোরূপে। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রাণিবিদ্যার ভিজিটিং অধ্যাপকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং য়ুরোপের বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন, শিক্ষাধারা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে।

তাঁর উচ্চাঙ্গের গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে নিউ ইয়র্কের রকফেলার ফাউণ্ডেশন তাঁকে বেশ মোটা অর্থ সাহায্য করেন, বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রাণিবিদ্যার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ডাঃ শেষাচার লণ্ডন ও ভারতের জুলজিক্যাল সোসাইটির, আমেরিকান সোসাইটি অব প্রোটোজুলজিষ্টস্, ইণ্টারন্যাশানাল সোসাইটি ফর সেল বায়োলজি এবং সোসাইটি সিগমা-ফাই-এর ফেলো। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাণিবিদ্যা ও পতঙ্গবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

হোমি জেহাঙ্গীর ভাবা

১৯০৯ সালের ৩০শে অক্টোবর ডাঃ ভাবা বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পারসীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঠাকুর্দ্দা মহীশুরষ্টেটের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, এবং পিতা বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে টাটার একজন প্রতিনিধি।

বোম্বাই শহরে পাঠ সমাপ্ত করে ভাবা মাত্র ১৭ বছর বয়সে কেম্ব্রিজের গণভিল এণ্ড কায়াস কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হ'ন। এক বছর পরে তিনি গণিতে ট্রাইপস্ (প্রথম অংশ) পাশ করেন। অতঃপর তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে যান এবং ১৯৩০ সালে প্রথম বিভাগে এই বিষয়ে ট্রাইপস্ (দ্বিতীয় অংশ) পাশ করেন। ১৯২৯ সালে ছুটীর অবসরে তিনি রাগবীতে ব্রিটিশ টম্পসন হাউষ্টন ওয়ার্কসে হাতে কলমে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষানবিশী করেন।

১৯৩০ সালে ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি গাণিতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক ডিরাক ও মটের অধীনে দুই বছর তিনি আধুনিক বিজ্ঞানতত্ত্ব অধ্যয়ন করলেন। এখন পর্য্যন্ত তিনি একাধিক কলেজ স্কলারশিপ পেতেন। ১৯৩২ সালে তিনি ট্রিনিটি কলেজ থেকে উচ্চগণিত শিক্ষার জন্য রাউজ বল ট্র্যাভেলিং ষ্টুডেণ্টশিপ পান এবং ১৯৩২-৩৩ সাল অতিবাহিত

করেন জুরিকে, অধ্যাপক পাউলির অধীনে কাজ ক'রে। এই সময় তিনি এক উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে তিনি কাজ করেন, রোমে অধ্যাপক ফার্মির অধীনে এবং উট্রেক্টে অধ্যাপক ক্রামারের সঙ্গে। তারপর ১৯৩৬-৩৭ সাল কাটান কোপেনহ্যাগেনে, অধ্যাপক নীল বোরের ইনষ্টিটিউট অব থিয়োরেটিকাল ফিজিক্সে, পদার্থ-বিজ্ঞানের বিখ্যাত গবেষণাগারে।

১৯৩৫ সালে তিনি তিন বছরের জন্য আইজাক নিউটন ষ্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পেলেন তিন বছরের জন্য ১৮৫১ সালের রয়াল এগজিবিশন স্কলারশিপ। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত ডাঃ ভাবা কেম্ব্রিজে উচ্চ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন, যথা,—মহাজাগতিক রশ্মির * বিকীরণ, আণবিক পদার্থ বিজ্ঞান, কোয়োণ্টাম গতিবিদ্যা ইত্যাদি। ১৯৩৭

* মহাজাগতিক রশ্মি—মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা তড়িতাবিষ্ট হয়ে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে আসে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের পথ ধরে আর তা আলোক রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় সংঘাতের ফলে নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি মেসনে পরিণত হয়। ভূপৃষ্ঠে যে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পৌঁছায় তার অধিকাংশই এই মেসন কণিকা। জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা চলছে এরই মাধ্যমে।

সালে ম্যাক্স বর্ণের আমন্ত্রণে তিনি এডিনবরায় গিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির বিকীরণ সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ১৯৩৯ সালে রয়াল সোসাইটী, কালে পদক ভাণ্ডার থেকে তাঁকে টাকা দেন, মাঞ্চেষ্টারে অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা-গারে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করার জন্য, যাতে করে তিনি স্বাধীনভাবে কেম্ব্রিজ ও মাঞ্চেষ্টারে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। ঐ বছরই তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়, ব্রুসেল্‌সে সলভে কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে কনফারেন্স হতে পারে নি।

১৯৩০ সালের পূর্ব্বে তিনি গ্রীষ্মের অবকাশে প্রায়ই ভারতে আসতেন, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি আর বিলাতে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। তখন থেকে তিনি বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করতে থাকেন। ১৯৪২-৪৫ সালে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪১ সালে ডাঃ ভাবা বিলাতের এফ-আর-এস্ উপাধি লাভ করেন এবং ১৯২৩ সালে তাঁকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে উচ্চ গবেষণার জন্য অ্যাডামস্ পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বছরই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতির এবং ১৯৫১ সালে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯৪৫ সালে বোম্বাই শহরে টাটা ইনষ্টিটিউট গবেষণাগার খোলা হয়। তিনি গোড়া থেকেই এর ডিরেক্টর। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি আণবিক গবেষণা কমিটি এবং ভারতীয় আণবিক

টি, আর, শেষাদ্রি

হোমি জেহাঙ্গীর ভাবা

পি, ভি, সুখাত্মে

এস, সি, দত্ত

শক্তি গবেষণা বোর্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার আণবিক শক্তি কমিশন স্থাপন করেন এবং প্রথম থেকেই তিনি চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্ম বিভূষণ (দ্বিতীয় বর্গ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়া সরকার এবং ন্যাশানাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের উদ্যোগে পার্থে অনুষ্ঠিত প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন।

পি, ভি, সুখাত্মে

১৯১১ সালের ৭ই জুলাই ডাঃ সুখাত্মে পুণায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় পুণার মহারাষ্ট্র এডুকেশন সোসাইটিব উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ফার্গুসন কলেজে। ১৯৩২ সালে তিনি গণিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হ'ন। ১৯৩৩ সালে তিনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগ দেন এবং বিখ্যাত অধ্যাপক পিয়ার্সন ও নাইম্যানের অধীনে গবেষণা করে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের রদামষ্টেড কৃষি পরীক্ষাগারে যোগ দেন। পরে লণ্ডনের গার্টন পরীক্ষাগারে জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ফিশারের অধীনে বাই-পার্টিশন্যাল ফাংশান সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেন এবং এর জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস্‌সি উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর এই গবেষণা ১৯৩৮ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কর্তৃক ফিলজফিক্যাল ট্রান্‌জ্যাক্‌শানে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে ভারতে ফিরে তিনি কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজীতে পরিসংখ্যক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৩৮ সালে তিনি ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পরিসংখ্যকের পদলাভ করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই কলিকাতার

অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেলথের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা বিভাগের কাউন্সিলের পরিসংখ্যক নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৪৫ সালে এই কাউন্সিলের পরিসংখ্যান বিষয়ের উপদেষ্টা পদে উন্নীত হ'ন। একাজ ছাড়া তাঁকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে উপদেষ্টারূপে কাজ করতে হ'ত, বিশেষ করে কৃষি বিভাগের ব্যাপারে। ভারত সরকারের তিনি নমুনা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এই পদে থেকে সরকারকে প্রয়োজন মত পরিসংখ্যান কাজে সাহায্য করেছেন।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে এখন তাঁরই উদ্ভাবিত কৃষিক্ষেত্রে নমুনা দেখে পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস এবং বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান আকাদেমী অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কৃষি সংস্থা এবং খাদ্য পরিসংখ্যান উপদেষ্টা কমিটির তিনি সহ-সভাপতি। ১৯৪৭ সালে তিনি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক পরিসংখ্যান কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৮ সালে সিঙাপুরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পরিসংখ্যান কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ইণ্টারন্যাশানাল স্কুল অন সেন্সাস এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্সের (জনসংখ্যা ও পরিসংখ্যানের

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান) ডিরেক্টর এবং ১৯৫০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিসংখ্যান শাখার সভাপতিত্ব করেন।

এস, সি, দত্ত

১৮৯৯ সালে শ্রীহট্ট জেলায় (অধুনা পূর্ব্ব পাকিস্থান) মেজর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে রাজসাহী থেকে অনার্স নিয়ে বি-এস্‌সি পাশ করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নশাস্ত্র বিভাগের এম-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন। আচার্য্য ৺প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শে ১৯২১ সালে ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে তিনি বিলাত চলে যান ও সেখানে রয়াল ভেটারিনারী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। ১৯২৫ সালে তিনি এম-আর-সি-ভি-এস্ উপাধি লাভ করেন।

ভারতে ফিরে তিনি বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হ'ন ও সেই সঙ্গে তিনি ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ স্বর্গত কর্ণেল অ্যাক্টনের অধীনে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে রিসার্চ্চ অফিসাররূপে যোগ দেন এবং বিভিন্ন বিভাগের অফিসার-ইন-চার্জ্জের দায়িত্বও বহন করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি আবার বিলাত যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-টি-ভি-এম্ এবং ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি মিলিটারী সার্ভিসে যোগ দেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ ক'রে অনেক সামরিক পদক ও

ষ্টার লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি আবার বেসামরিক জীবনে ফিরে আসেন এবং পুনরায় ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে যোগ দেন। এবার এলেন একেবারে ডিরেক্টররূপে। ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর পদে তিনিই প্রথম ভারতবাসী।

ডাঃ দত্ত এডিনবরার রয়াল সোসাইটির এবং ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সেস-এর ফেলো। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিনি বহু আন্তর্জ্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন, যথা—১৯৩৮ সালে জুরিখে অনুষ্ঠিত ইণ্টার ন্যাশানাল ভেটারিনারী কংগ্রেস, ১৯৩৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারী কংগ্রেস, ১৯৪৮ সালে নায়রোবিতে অনুষ্ঠিত এফ, এ, ও, রিণ্ডারপেষ্ট কনফারেন্স, ১৯৫০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশানাল ফুট এণ্ড মাউথ ডিজীজ (পায়ের ও মুখের রোগ) কনফারেন্স ইত্যাদি।

১৯৫৩ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসাবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

এম, বি, সোপারকর

১৯০৬ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে ডাঃ সোপারকর কিছুদিন এক ভারতীয় করদরাজ্যে প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। পরে বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের ফেলো ও টিউটর নিযুক্ত হ'ন। তার পর তিনি বোম্বাইয়ের জে. জে. হাসপাতালের ক্লিনিকাল রেজিষ্ট্রার এবং অবৈতনিক সহকারী ডাক্তারের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলার অব হাইজীন এবং ১৯১৩ সালে এম-ডি উপাধি লাভ করেন।

এর পর দু' বছরের জন্য তিনি বোম্বাইএর হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটে যক্ষ্মারোগের অবৈতনিক গবেষক নিযুক্ত হ'ন। এখান থেকে তিনি ইম্পিরিয়াল ব্যাক্‌টিরিওলজিক্যাল ডিপার্ট-মেণ্টে (অধুনা মেডিক্যাল রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্টে) অফিসাররূপে যোগদান করেন। এই পদ আই-এম-এস্ অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সার্ভিসের বাইরে থেকে তিনি প্রথম এই পদলাভ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণু পরীক্ষার জন্য এক বিশেষ মাধ্যম আবিষ্কার করেন। চিকিৎসা জগতে এর নাম "সোপারকর মাধ্যম"।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বদেশে

ফিরে এল, তখন দেখা গেল যে অনেকেই শিপ্টোসোমে (এক-প্রকার রোগ) আক্রান্ত। এই রোগ যাতে ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে সেইজন্য ডাঃ সোপারকর গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখান যে এই রোগের কারণ ঐ রোগে পীড়িত জন্তুর দেহ-নির্গত শূক-জাতীয় বীজাণু। তিনি এর প্রতিরোধেরও বিধান দেন।

যক্ষ্মা বীজাণু নিয়ে তিনি বহুদিন গবেষণা করেন। কি ভাবে এরা পুষ্ট হয়, মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং কি ভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে এই সম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য নির্ণয় করেন। ১৯২০ সালে তিনি বোম্বাই-এর হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর (অস্থায়ী) নিযুক্ত হ'ন। ১৯২২ সালে তিনি কসৌলীর সেণ্ট্রাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর (অস্থায়ী) নিযুক্ত হ'ন। এইখানে থাকা কালে তিনি এক নূতন বীজাণু আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ সালে তাঁকে মুখতেশ্বরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব ভেটারিনারী রিসার্চ্চ পরীক্ষাগারে পাঠান হয়, জন্তুদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ সম্বন্ধে গবেষণা করতে। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে এই গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হয়। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, ভারতে জন্তুদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের বিলক্ষণ প্রাতুর্ভাব রয়েছে। বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশী। প্রতিরোধক হিসাবে কতকগুলি পন্থাও তিনি নির্ণয় করেন। পরে যক্ষ্মা সন্ধানী

বিভাগ বোম্বাই-এর হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি মনুষ্যদেহে এই রোগের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করেন ও রোগীদের বিভিন্ন অবস্থার তালিকা প্রস্তুত করেন।

১৯৩৫ সালে ডাঃ সোপারকর স্থায়ী ভাবে হফ্‌কিন ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এখানে তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। মাদ্রাজের গুইন্দীতে অবস্থিত কিং ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করে কলেরা রোগ সম্পর্কেও অনেক নূতন তথ্য নির্ণয় করেন।

১৯১৪ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দোসাভাই হরমসজী কামা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৭ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য 'মিণ্টো' স্বুবর্ণ পদক পান। পরে তিনি পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী পদকও লাভ করেন। ডাঃ সোপারকর ভারতের ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র শাখার সভাপতিত্ব করেন।

আর, এস, কৃষ্ণন

১৯৩৩ সালে স্যর সি, ভি, রমনের অধীনে বাঙ্গালোরের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে প্রথম যে ছাত্রদল পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য যোগদান করেন, আর, এস, কৃষ্ণন তাঁদের অন্যতম। কোলয়েড এবং তরল মিক্‌শ্চারে আপতিত আলোকের বিচ্ছুরণ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা করেন। ১৯৩৩-৩৮ সালে তিনি বহু পরীক্ষার পর আলোক-বিচ্ছুরণের একটি সূত্র আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে আলোক-বিদ্যার বহু জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মহলে এই আবিষ্কার "কৃষ্ণন এফেক্ট" নামে পরিচিত। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁর নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৩৮ সালে তিনি ১৮৫১ সালের রয়াল এগ্‌জিবিশন স্কলারশিপ লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই গৌরবের অধিকারী-বৃন্দের তিনি অন্যতম। কেম্ব্রিজে গিয়ে তিনি ক্যাভেণ্ডিশ পরীক্ষাগারে যোগ দেন এবং কৃত্রিম স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা * নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন।

* রেডিও অ্যাক্টিভিটি—বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা। রেডিয়াম জাতীয় ভারী মৌলিক পদার্থের অস্থায়ীত্বের জন্য তাদের পরমাণু-কেন্দ্রীন আপনিই ভেঙ্গে তা থেকে তেজস্ক্রিয় তড়িতা-

কেম্ব্রিজে থাকাকালে তিনি ট্রিনিটি কলেজের সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৩৯-৪১ সালে তাঁকে ক্যাভেণ্ডিশ সাইক্লোট্রনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয় এবং ভারী মৌলিক পদার্থের ভাঙ্গন সম্পর্কে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পান। থোরিয়াম, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ভারী মৌলিক পদার্থের তড়িতাবেশ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর উচ্চাঙ্গের গবেষণা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা অর্জ্জন করে এবং লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ও কেম্ব্রিজের ফিলজফিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে তিনি ভারতে ফিরে বাঙ্গালোরের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে যোগ দেন। এক্সরে এবং বর্ণালী সম্পর্কিত কৃষ্টাল ফিজিক্সে (স্ফটিক পদার্থবিদ্যা) গবেষণা করতে থাকেন।

তিনি যে ফলাফল নির্ণয় করেছেন তাতে কঠিন পদার্থের বহু রহস্যের সমাধান হয়েছে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা হ'ল বিভিন্ন স্ফটিক, যথা,—হীরক, খনিজ লবণ, পটাসিয়াম ব্রোমাইড, অ্যামোনিয়াম হ্যালাইড ইত্যাদির রমন-বর্ণালীর

বিষ্ট কণিকাধারা নির্গত হয়। ক্রমাগত তেজ বিকিরণের ফলে পদার্থের পরমাণবিক গঠন বদলে গিয়ে মৌলিকে পরিণত হয়। যন্ত্রের (সাইক্লোট্রন, অ্যাটমিক পাইল ইত্যাদি) সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও বিভিন্ন রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ (পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকে অথচ ওজন বদলে যায়) তৈরী করা যায়।

দ্বিতীয় ক্রম আবিষ্কার। স্ফটিক জালির কম্পনের তথ্যে এই আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ডাঃ কৃষ্ণন দেশ বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সোসাইটির সভ্য। ১৯৪১ সালে তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। এই গৌরব তাঁর পূর্ব্বে কেবল আর একজন ভারতীয় অর্জ্জন করেছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান আকাদেমী অব সায়েন্সের ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক রমন অবসর গ্রহণ করাতে তিনি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন।

১৯৪৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬